শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ কথিত —

মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ

(একটি পর্যালোচনা)

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ কথিত —

মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ

(একটি পর্যালোচনা)

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

প্রাপ্তিস্থান

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
(অরুণ ঘোষ)
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন-৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

বারাসাত রেলওয়ে বুক স্টল
(শ্রীশ্যামল রায়)
প্লাটফরম নং ২-৩
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন-৯৮৩০৬৫২৪৬৯

MAHATMA MAHAMMAD-O- TAR UPADESH
[Mahatma Mahammad And His Sermons]
By Swami Avedananda
[A Rejoinder By Shri Debajyoti Roy & Others]

* প্রথম সংস্করণ ঃ আগষ্ট ১০, ২০১১
* দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুযারি ১, ২০১২

* প্রকাশক ঃ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস
১২ বিবেকানন্দ রোড
কোলকাতা-৭০০ ০৭৫

* মুদ্রণে ঃ ডি অ্যাণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ,
গঙ্গানগর, কলকাতা- ৭০০১৩২
ফোন- ০৩৩-২৫৩৬ ৮৮৮০

মূল্য ঃ ১৫ টাকা মাত্র

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচঞ্চল দেবনাথ
আনন্দ আশ্রম, ২৩/২, নতুনপুকুর, বারাসাত, কলকাতা - ১২৪
ফোন - ৯৮৩৬২৬৮১৪৩

অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস
সম্পাদক, 'ওম গাণ্ডীব', মালিপুকুর, দ. ২৪ পরগনা।
ফোন - ৯৮৩২৯৫৮৫৭৮

এই উপমহাদেশের
হিন্দু সাধু–সন্ত–জ্যোতির্মীমণ্ডলী,
রাজনীতিবিদ এবং সর্বস্তরের
বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

এই পুস্তিকায় যে সব তথ্য দেওয়া হল, সেগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনো প্রকার কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। তবুও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর চোখে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়া হবে।

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬

ভারত-রত্ন ড. আম্বেদকর বলেছেন —

ড. বি.আর. আম্বেদকর

'মুসলমানরা তাদের কাজের অনুপ্রেণা লাভ করে কোরান-হাদিস থেকে এবং হিন্দুরা তাদের কাজের প্রেরণা পায় রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। তাই এই দুই জনগোষ্ঠীর মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই।'

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, নৃতত্ত্ববিদ এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ ড. আম্বেদকরের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য আমরা সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত হিন্দু-সাধু সন্ত এবং মানবাধিকার কর্মী ও তাত্ত্বিকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা বলছি —

মুসলিম দুনিয়া যতদিন প্রামাণ্য নথি-পত্রের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মকে ধর্ম বলে স্বীকার না করবে, ততদিন ভারত বা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আসবে না কিংবা জঙ্গিবাদ বিলুপ্ত হবে না। ভারতের সব সাধু-সন্ত একত্রিত হয়ে লক্ষ কণ্ঠে নবী মহম্মদের গুণকীর্তন করলেও না। সর্বধর্ম সমন্বয় নামক 'কবচ-তাবিজ' বিক্রী করা কোনো কাজেই আসবে না। তা যদি হত তবে এই উপমহাদেশে এতদিনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মিটে যেত। বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ 'কবচ-তাবিজ' এবং হিন্দু রাজনীতিদিদের ভালমানুষী হিন্দুদের দুর্গতির বহর দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। মানব সভ্যতার কলঙ্ক জঙ্গী কাসভ এবং আজমল গুরুর ফাঁসি স্থগিত রয়েছে। বাংলাদেশ গত ৩০.৬.২০১১ তারিখে তাদের সংবিধানে ইসলামকে রষ্ট্রধর্ম হিসেবে অটুট রেখে তার সঙ্গে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' যুক্ত করা হয়েছে। আর সমগ্র হিন্দু সমাজকে বুদ্ধু বানাবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিও রাখা হয়েছে।

হিন্দুরা ইসলামের শত্রু — এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে ১৯৪৭-এ দেশ-ভাগ এবং ১৯৬৫-তে পাকিস্তানে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' পাশ হয়েছিল। দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে ঐ আইনটির মুখোশ পরিবর্তন করা হল গত ২৯.১১.২০১১ তারিখে। কার্যত হিন্দুদের শত্রুই রাখা হল। একজন বাংলাদেশী মুসলমান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যতদিন বসবাস করুক না কেন, বাংলাদেশে তার পৈত্রিক বা নিজের অর্জিত সম্পত্তি অটুট থাকবে। কিন্তু একজন হিন্দুর ক্ষেত্রে এ নিয়ম চলবে না। ১৯৬৫ থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪৩ একর জমি মোল্লা-মৌলভী-রাজনীতিবিদরা ছিনিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে সরকারের দখলে আছে মাত্র ১ লক্ষ একর। এই জমিটুকুই সেই সব হিন্দুরাই ফেরত পাবে যারা **বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক।** (আ.বা.প., ১৫.১২.২০১১) আইনের এই ফাঁক দিয়ে 'দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন' নবীজীর অনুগামীরা দাবি তুলবে ইসলাম, আল্লাহ্ ও নবীজীর শত্রু হিন্দু-বৌদ্ধরা কখনও বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে পারবে না।

প্রকাশকের নিবেদন

৬১০ খ্রী. সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র একজন। আজ তাদের সংখ্যা ১২৫ কোটির বেশি। ১৯৫১-র সেন্সাসে ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ। ২০০১-র সেন্সাসে ১৩ কোটি ৮২ লক্ষ। ২০১১-র সেন্সাসে এই সংখ্যা বেড়ে ১৭/১৮ কোটিতে দাঁড়াবে হয়ত । ২০৫০-এর মধ্যে ভারতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে, এ কথা আজ অনেকেই স্বীকার করছেন। ইতিমধ্যেই 'মোঘলস্থান' গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, যার শেষ পরিণতি হবে 'মুসলিম ভারত গঠন'। মুসলিম পাটিগণিত মতে ভারতকে নাকি আবার স্বাধীন করতে হবে। এমন একটি সময় আমাদের হাতে দু'টি বই আসে — 'যুগে যুগে যাদের আগমন' এবং 'মহাত্মা মহম্মদ এবং তাঁর উপদেশ'। দু'খানা বই-ই লিখেছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ। প্রকাশ করেছেন কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। প্রথম বইটি থেকে মাত্র একটি নিবন্ধ নিয়ে দ্বিতীয় বইটি (পুস্তিকা) প্রকাশ করা হয়েছে। এটিতে অভেদানন্দজী নবী মহম্মদ সম্পর্কে কিছু সত্য, কিছু কল্পনা এবং কিছু অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করার ফলে পাঠকবৃন্দ বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলে আমরা মনে করি।

নবী মহম্মদ ছিলেন অসম সাহসী যোদ্ধা। 'ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অন্য দেশকে আক্রমণ করা যায়' — সৃষ্টি ছাড়া এই বিধান তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য সব ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের পদতলে নিয়ে আসা। অভেদানন্দজী এই নবীজীকে মহাত্মা বলে চিহ্নিত করে তাঁর গুণগানে মুখর হয়েছেন। অভেদানন্দজীর বিচারে 'কোরান হচ্ছে সুন্দর আরবীতে লেখা আধ্যাত্মিক আলোকে ও জ্ঞানে পূর্ণ'। কোরানের শ্লোকগুলি 'সুন্দর ও সুমধুর', 'বাহান্ন বছর বয়সে মহম্মদের দিব্য দর্শন হয়', 'মদিনাতে আরও অনেক দিব্য অনুভূতি হয়েছিল'। কিন্তু যারা কোরান পড়েছেন তারাই জানেন কোরানের ৬,৬৬৬-টি আয়াতের মধ্যে কোথাও হিন্দু, সনাতন বা আর্য শব্দের উল্লেখ নেই। সেদিন পৃথিবীর সর্বত্রই কোন না কোন প্রকারের মূর্তি বা প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। নবীজী সকল প্রতিমা পূজারীদের সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। ভারতে আমরাই সেই প্রতিমা পূজারী।

নবীজী মদিনা গিয়ে ১০ বছর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৮২-টি যুদ্ধে (জেহাদ বা বিধর্মী নিধন যুদ্ধ) অংশ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে ২৬-টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন নিজে। প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি 'গাজী' হয়েছিলেন। 'গাজী' শব্দের অর্থ বিজয়ী। যিনি বিধর্মীকে হত্যা করেছেন, তিনিও 'গাজী'। এই ৮২-টি যুদ্ধের মধ্যে অভেদানন্দজী মক্কা জয়ের যুদ্ধের কথাই কেবল উল্লেখ করেছেন। আর সবগুলো এড়িয়ে গেছেন। ইসলাম প্রচারের কারণে তিনি যে পার্শ্ববর্তী একাধিক দেশ আক্রমণ করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। ৮২-টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেও ১০ বছরের মধ্যে মহম্মদ ১১-টি বিয়ে করেছেন। তার আগে একটি। মোট ১২-টি। কিন্তু অভেদানন্দজী লিখেছেন, বিবি খাদিজার মৃত্যুর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। এই তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত। তখন বাধ্য হয়ে প্রকাশক পুস্তিকাটিতে নবীজীর ১২-জন স্ত্রীর নাম সংযোজন

করেন। কিন্তু বড় বইটিতে কোন সংশোধন করা হয়নি। এটি যারা পড়বেন তারা জানবেন নবীজী জীবনে একটি মাত্র বিয়ে করে ৬৩ বছর ধরে প্রায় ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করে গেছেন।

একবার উকল গোত্রের কয়েকজন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলে 'দিব্য অনুভূতি সম্পন্ন' নবীজী তাদের উপর খুব সদয় হন। থাকার ব্যবস্থা করেন। পরে একদিন ঐ নয়া মুসলমিরা ইসলাম ত্যাগ করে কয়েকটি উট নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন তাদের ধরে এনে নবীর সামনে হাজির করানো হল। নবীজী ঠিক করলেন তাদেরকে নিজ হাতে সাজা দেবেন। দু'টি লোহার শিক আগুনে পুড়ে লাল করে অপরাধীদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে তাদের পা কেটে আলাদা করে ফেলে দুপুরের কড়া রোদে মরুভূমির তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখলেন। তারা জল খেতে চাইলে নবী তা দিতে সবাইকে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা মারা গেল। (সহি মুসলিম-৪১৩০-৩২)। ইসলাম ত্যাগ করার শাস্তি প্রাণদণ্ড; বিধান দয়াল নবীর।

"মদিনায় এসে তিনি (নবীজী) কোরানের সঙ্গে তুলে নিলেন তরবারি। সেই তরবারি দিয়ে তিনি অসংখ্য বিধর্মীদের হত্যা করেছেন, তাদের বন্দি করেছেন, তাদের ধনসম্পদ লুট করেছেন। যে ইহুদিরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল সেই ইহুদিদের তিনি মদিনা থেকে নির্বাসিত করেছেন নিষ্ঠুরভাবে।" এই উক্তি বহরমপুরের (পশ্চিম বঙ্গ) শিক্ষক গিয়াসুদ্দিনের। (দেখুন ঃ তাঁর 'মুসলিম সমাজ বনাম ফতোয়া সন্ত্রাস', পৃ-৫৮)

মক্কা জয় করে সেখনাকার কা'বা শরীফে রক্ষিত বিভিন্ন দেবদেবীর ৩৬০-টি মূর্তি ধ্বংসের কাজ নিজের হাতে শুরু করে স্বর্গলাভের যে পথ আবিষ্কার করে গেছেন, সেই পথ ধরেই পৃথিবী জুড়ে মূর্তি ভাঙার কাজ আজও অব্যাহত ভাবে চলছে।

সাড়ে চোদ্দ শত বছর ধরে এই বর্বরতা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এর ফলে ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন হিন্দু এবং বৌদ্ধরা। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ বিতাড়নের কাজ চলছে। অথচ ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ রাজনীতিবিদদের সিংহভাগ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলিম তোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর বাঙালি সাধু-সন্তদের সিংহভাগ দু'হাত তুলে তা সমর্থন করছেন।

বাস্তব ক্ষেত্রে কোরান হচ্ছে হিংসার উপর ভিত্তি করে রচিত পৃথিবী জুড়ে অশান্তি সৃষ্টিকারী একটি সামরিক মতবাদের গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের মধ্যে 'আধ্যাত্মিক আলো এবং জ্ঞান' আবিষ্কার করে অপ-ইতিহাস সৃষ্টি করলেন অভেদানন্দজী। বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক এবং ইসলাম-তত্ত্ববিদ শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের নেতৃত্বে ১৫ জন বাঙালি প্রকাশকের কাছে তারিখে একটি চিঠি লিখে (৬.৬.২০১১) ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রকাশক ঐ চিঠির উত্তর দেবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে জানান, এই চিঠির উত্তর দিতে তাঁরা বাধ্য নন। তাই বৃহত্তর স্বার্থে সর্বস্তরের মানুষদের হাতে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে চিঠিটি পুস্তিকার আকারে প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছিল ২০১১-এর ১ আগষ্ট। আজ ১.১.২০১২ তারিখে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি। নমস্কার সহ —

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস।

সমীপেষু ঃ স্বামী সত্যকামানন্দ।

প্রযত্নে ঃ সাধারণ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

১৯, এ-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০০৬

ফোন- (০৩৩) ২৫৫৫ ৮২৯২ এবং ২৫৫৫ ৭৩০০

ই-মেইল - ramkrishnavedantamath@vsnl.net

৬ জুন, ২০১১

শ্রদ্ধেয় মহারাজ,

নমস্কার নিন। আমরা (পত্র-প্রেরকবৃন্দ) বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক হলেও পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি প্রাণ এবং ধর্ম বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। ওখানে আমরা কেউ ছিলাম বৈষ্ণবপন্থী (ইসকন, মহানাম ইত্যাদি), কেউ রামকৃষ্ণপন্থী। আবার কেউ বা মতুয়াপন্থী। কেউবা মহাযোগী বাবা লোকনাথজীর আশ্রিত। যতটা জানতে পেরেছি, এখানকার একাধিক হিন্দুধর্মীয় সংগঠনের প্রধান এবং সন্ন্যাসীদের বড় একটি অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত; হয় আমাদের মতো বিতাড়িত, নয়তো স্বেচ্ছানির্বাসিত। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বলে পরিচিত বালক ব্রহ্মচারীর (১৯২০-১৯৯৩) জন্ম ঢাকায়। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীঅভয় চরণ দে) পশ্চিমবঙ্গের সন্তান হলেও তাঁদের পরমারাধ্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতৃদেব এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ওরফে শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় হুগলী এবং স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার ছেলে হলেও তাঁদের অনুগামী সন্ন্যাসীদের সিংহভাগ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের একীভুত রূপ বলে অনেক হিন্দুরা যাঁকে শ্রদ্ধা করেন সেই প্রভু জগদ্বন্ধুর জন্ম হয়েছে পূর্ববঙ্গে। এই মহাপুরুষের জন্ম তারিখ কিংবা মা-বাবার পরিচয় জানা যাচ্ছে না। তাঁর পালক পিতা-মাতা তাঁকে গঙ্গায় ভাসমান অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। জগদ্বন্ধু শব্দটির অর্থ 'জগতের বন্ধু'। ভক্তরা তাঁকে 'নব-গৌরাঙ্গ' নামে বিশেষিত করেছেন। তিনি এতটাই দৈবী শক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে একটি বদ্ধ ঘরে থেকে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅঙ্গনে (ফরিদপুর)। ১৯২১-এর ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর ইহলীলা সমাপ্ত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বছরের ৩৬৫ দিন অহোরাত্র 'নাম-কীর্তন' চলছে। তবে ১৯৭১-এ দীর্ঘদিন ধরে কীর্তন বন্ধ ছিল। তাঁর প্রধান অনুগামী হিন্দু ধর্মগুরুদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির নাম বঙ্কিম দাশগুপ্ত ওরফে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (১৯০৪- ১৯৯৯)। তাঁর জন্ম বরিশালের খলিসাকোটা গ্রামে। ব্রহ্মচারীজী নিজে স্থায়ী ভাবে ভারতে বসবাস করেননি বটে; তবে অজস্রবার তিনি ভারতে এসেছেন এবং তাঁর হাজার হাজার ভক্ত বাংলাদেশ ছেড়ে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ প্রণবানন্দজীর জন্ম ১৮৯৬-এ, ফরিদপুর জিলার বাজিতপুরে। দেহ রেখেছেন কলকাতায় (১৯৪১)। তবে তিনি এসেছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে।

অগণিত ভক্তদের কাছে যিনি দয়াল ঠাকুর বলে পরিচিত, যিনি 'শ্রীচৈতন্য রসুল (মহম্মদ) এবং কৃষ্ণে' বিন্দুমাত্র প্রভেদ দেখেননি, সেই ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের (১৮৮৮-১৯৬৯) জন্ম পাবনার হেমায়েতপুরে। ১৯৪৬-এর ১৬ আগষ্ট কলকাতায় মহাদাঙ্গা ঘটে যাবার পর তিনি ১ সেপ্টেম্বর পরিবার-পরিজন এবং কতিপয় ভক্তসহ এদেশে চলে আসেন।* পেছনে পড়ে থাকল তাঁর হাজার হাজার শিষ্য-শিষ্যা এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ।** পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঙালি মেয়ে মা আনন্দময়ী (নির্মলা সুন্দরী, ১৮৯৬-১৯৮২), যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিব, শাক্ত এবং শৈবদের সমান চোখে দেখতেন এবং যিনি নিজের স্বামীকে দীক্ষা দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন, তিনিও জন্মভূমি ছেড়ে এ দেশে এসেছিলেন। ভবা পাগলার (১৯০২-১৯৮৪) জন্ম ঢাকা জিলার আমতা গ্রামে। তিনি বাইবেল এবং কোরানের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বিভেদ খুঁজে পাননি। ঠিক করেছিলেন পূর্ববঙ্গেই থেকে যাবেন। কিন্তু ভারত-ভাগের পর তাঁকেও এ দেশে চলে আসতে হয়েছে। ফরিদপুরের রাম ঠাকুর (১৮৬০-১৯৪৯) এখানে না এলেও তাঁর অগণিত ভক্ত এ দেশে চলে এসেছেন। শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বরিশালের দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস (১৮৯২-১৯৭৫) ৫৮ বছর বয়সে ১৯৫০-এ কতিপয় ভক্ত নিয়ে ভারতে চলে আসেন এবং কুমিল্লার (চাঁদপুর) স্বরূপানন্দ পরমহংস, ওরফে বঙ্কিম গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৪) পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন, ১৯৪৭-এর পরপরই। এ ছাড়া ওখান থেকে অন্য যে সব মহান, উদার, অহিংস, সর্বধর্ম সমন্বয়কারী ছোট মাপের ব্রহ্মচারী চলে এসেছেন তাঁদের সংখ্যাও কয়েক হাজার হবে। সম্প্রতি একজন বিবাহিত ব্রহ্মচারীর খবর পাওয়া গেছে। বয়স এখনও ৪০ হয়নি। তাঁর মা-বাবা এবং ভাইবোন অনেকের জন্ম ফরিদপুরে। তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি অটল বিহারী বাজপেয়ী সহ অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ড. মহানামব্রত এবং বালক ব্রহ্মচারী সহ অনেক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছেন। বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। কালী-ভক্ত এই নবীন ব্রহ্মচারী মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে ইসলামী মতে সাধনা করেছেন, বাড়ীতে নামাজ পড়েছেন এবং আল্লা-হো-আকবর বলে চীৎকার করেছেন। তার একজন ভক্তের স্থির বিশ্বাস তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হবেন। কারণ, তারা দু'জনেই মূর্তিপূজায় চরম বিশ্বাসী হয়েও মূর্তি পূজায় চরম অবিশ্বাসী ইসলাম মতে সাধনা করেছেন এবং তারা দু'জনেই বিবাহিত ব্রহ্মচারী। তবে প্রথম জন ছিলেন নিঃসন্তান; দ্বিতীয়জন এক সন্তানের জনক। প্রথম জন যেমন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে ঈশ্বর দেখাবার কথা বলেছেন, দ্বিতীয়জন তেমনি ভক্তদের বলেছেন, "শ্রীভগবানের দর্শন লাভ সম্ভব এবং এটি পরীক্ষিত সত্য।"

---

* ৩০ আগষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মার্কিন ভক্ত ডি. নরম্যানকে দিয়ে বৈদ্যনাথ ধাম পর্যন্ত রেলের বগি রিজার্ভ করেন। কতিপয় ভক্ত সহ ১ সেপ্টেম্বর রওয়ানা হয়ে ২ সেপ্টেম্বর সকাল ১টায় দেওঘরে পৌঁছান। (সূত্র: শ্রীরমাশংকর ত্রিবেদীর 'দয়াল ঠাকুর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ-২৫-২৬)

** ১৯৪৬ থেকে এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে অন্যান্য ধনী ও গরীবদের ফেলে আসা সম্পত্তির মূল্য হবে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। তার মালিক 'মহাত্মা' নবীজীর প্রিয় বান্দারা।

১৯৪৬ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ হিন্দু তাদের ধর্ম, মান-সম্মান এবং প্রাণ রক্ষার্থে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। উপরোক্ত দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মচারী-মনীষীবৃন্দের অনেকেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে দাবি করছেন। তাছাড়া কোনো না কোনো ভাবে তাদের সঙ্গে 'শ্রীভগবানের' যোগাযোগ ছিল বা আছে বলে দাবি করতেন বা করছেন। ২/১ জন বাদে সকলের কাছেই ইসলাম অতি পবিত্র ধর্ম এবং নবীজী খোদার প্রেরিত পুরুষ, ভাষান্তরে 'পয়গম্বর'। এঁরা কিন্তু কেউ আমাদের পূর্ববঙ্গে মান-সম্মান নিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাই প্রশ্ন জাগে — কেন আমরা যুগ-যুগান্তরের জন্মভূমি ত্যাগ করে এদেশে চলে এলাম? বিনীতভাবে আপনার কাছে এই প্রশ্নটি রাখছি। যদি প্রশ্ন করেন, কলকাতায় এত সাধু-সন্ত থাকতে আপনার কাছে এই প্রশ্ন রাখছি কেন তাহলে বলব, সম্প্রতি কিছুটা আকস্মিক ভাবেই প্রয়াত স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ' শীর্ষক ছোট্ট একটি পুস্তিকা পড়ে আমাদের মনে এই প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। পুস্তিকাটির প্রকাশক আপনি।

স্বামী অভেদানন্দজী ছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) গুরুভাই, অতি আপন জন। অভেদানন্দ নামটি দেওয়া তাঁরই। তার আগে তিনি ছিলেন 'কালীপ্রসাদ'। অভেদানন্দজী কলকাতার ছেলে। জন্মেছিলেন ১৮৬৬-তে। পরলোক গমন করেন ১৯৩৯-এ। সম্ভবত তখনও 'রামকৃষ্ণলোক' আবিষ্কৃত হয়নি। দেখা যাচ্ছে অভেদানন্দজী বিবেকানন্দের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তবে ইহধামে ছিলেন বিবেকানন্দের তুলনায় ৩৭ বছর বেশি। সুতরাং পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ছিল অনেক অনেক বেশি। অভেদানন্দজীর কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কি ছিল আমরা জানি না। তবে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আমাদের জানা মতে বিদেশে গিয়ে তিন জন বাঙালি সাধু ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন— স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীমৎ স্বামী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

অভেদানন্দজী বিবেকানন্দের আহ্বানে লণ্ডনে যান ১৮৯৬-এ। সেখান থেকে নিউইয়র্কে যান ১৮৯৭-এ। ঐ বছরই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ১ মে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। অভেদান্দজী ২৫ বছর (৭ মাস কম) বিদেশে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯২১-এ। ফেরার পথে তিনি হনলুলু, জাপান, সাংহাই, হংকং, ক্যান্টন, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর এবং কুয়ালালামপুরে ভাষণ দেন। এখানে এসে ১৯২৩-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি নামে একটি পরিপূরক ধর্মীয় সংগঠন স্থাপন করেন। উল্লেখ্য বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় কিংবা বিবেকানন্দের মৃত্যুর সময় অভেদানন্দজী ছিলেন আমেরিকায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১৯৩৯-এ পরলোকগমনের কিছুদিন আগে অভেদানন্দজী প্রতিষ্ঠানটির নাম দেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

আমেরিকায় তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বিশ্বের 'পরিত্রাতাদের' বিষয়ে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি বাংলায় অনূদিত হয়ে 'যুগে যুগে যাঁদের আগমন' শিরোনামে

প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির এক একটি অংশ পৃথক পৃথক পুস্তিকাকারে পরিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য পুস্তিকাটি ('মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ') তারই একটি। এটির দু'টি কপি আমাদের হাতে এসেছে। দু'টিরই প্রকাশের তারিখ জানুয়ারি, ২০০৪। 'যুগে যুগে যাঁদের আগমন' শীর্ষক মূল গ্রন্থটিও আমাদের হাতে এসেছে। এটির ১৮১ নং পৃষ্ঠায় এবং ছোট পুস্তিকা দু'টির একটির ৩৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মহম্মদ তাঁর প্রিয় পত্নী খাদিজাকে হারান। আরববাসীদের সমাজে পুরুষের-বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকলেও মহম্মদ কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি।" ছোট পুস্তিকার দ্বিতীয় কপিটিতে ঐ ৩৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে —

"পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মহম্মদ তাঁর প্রিয় পত্নী খাদিজাকে হারান। আরববাসীদের সমাজে পুরুষের-বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকলেও মহম্মদ কিন্তু ততদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি।" এরপর একটি তারকা '*' চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে — " মে ২০০৫ সংখ্যার 'ও-বি-সি সংবাদে'-এ প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' থেকে জানা যায় যে, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Mohammad Encyclopedia Search *(Seerah?)* Foundation, Vol. II, page 206-এ উল্লিখিত আছে যে, মহম্মদের নীচে প্রদত্ত বারো জন পত্নী ছিলেন।" এরপর ঐ বারো জন পত্নীর নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। 'যুগে যুগে যাঁদের আগমন'-এ কিন্তু কোনো সংশোধন করা হয়নি। এটি যারা পড়বেন তারা জানবেন, নবীজী সমগ্র জীবনে একটি মাত্র বিয়ে করেছিলেন।

ছোট পুস্তিকার একটিতে দেওয়া তালিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ৬২ বছরের জীবনে নবীজী ১২-টি বিয়ে করেছিলেন। ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা ২ বা ৩ বারের বিধবা খাদিজাকে, ৫০ বছর বয়সে ৫০ বছর বয়স্কা বিধবা সৌধাকে। ৫৪ বছর বয়সে ৯ বছরের কুমারী আয়েষাকে *(প্রথম খলিফা আবু বকরের কন্যা)* বিয়ে করেন। বুখারী শরীফের ৭ম খণ্ডের ৮৮ নং হাদিস অনুসারে ৬ বছরের আয়েষাকে বিয়ে করেছিলেন নবীজী এবং তাঁর ৯ বছর বয়সে তাঁদের যৌনজীবন শুরু হয়। ৫৬ বছর বয়সে দু'টি বিয়ে করেন, ১৮ বছর বয়সের বিধবা হাফসাকে *(তৃতীয় খলিফা ওমরের কন্যা হাফসা বিন্ত ওমর)* এবং ৩০ বছর বয়সের বিধবা জয়নবকে *(জয়নব বিন্ত খুজাইফা)*। ৫৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন ২৯ বছর বয়সের বিধবা উম্মে সালমাকে *(হিন্দ বিন্ত খুজাইফা)*। ৫৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন তালাকপ্রাপ্তা ৩৫ বছর বয়সের জয়নবকে *(নবীজীর পালক পুত্র জায়েদের তালাক দেওয়া জয়নব বিন জাশ)*। একই বছরে ক্রীতদাসী জয়রিয়াকে *(জয়েরিয়া বিন্ত হাবিস)* বিয়ে করেন। জয়রিয়া তখন ছিল ২০ বছরের যুবতী। এরপর ৬০ বছর বয়সে নবীজী চারটি বিয়ে করেন — ৩৫ বছর বয়সের উম্মে হাবিবাকে, ১৭ বছর বয়সের বিধবা যুবতী সাফিয়াকে (সফিয়া বিন্ত হুজায়া), ৩৬ বছর বয়সের বিধবা মাহমুনা বিন্তকে (মাইমুনা বিন্ত হাবিস) এবং ২০ বছর বয়সের মিশরীয় ক্রীতদাসী (বিধবা) মারিয়াকে।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, অভেদানন্দজী যে সব ইতিহাস পড়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সব ইতিহাসে কি তাঁর এই সব বিয়ের/স্ত্রীদের উল্লেখ নেই? নবীজীর এই বহুবিবাহকে আজকের

বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলমানদের শতকরা ৯৯ জন স্বাগত জানাচ্ছেন। এই বিয়ের ব্যাপারে কয়েকটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তালাকপ্রাপ্তা জয়নবের স্বামীর নাম ছিল জায়েদ। তিনি ছিলেন নবীজীর পালক পুত্র। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে নবীজী জায়েদকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে। এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে কোরানে। ৩৩/৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, খোদা নিজে নবীজীর সঙ্গে জয়নবের (জয়নব বিন জাশ) বিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা যদি ঠিক বুঝে থাকি তবে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা। তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউই বিয়ে করেননি। আজও হাজার হাজার ভক্ত এই নিয়ম মেনে চলেছেন। তাঁর দর্শনের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে মৃন্ময়ী মূর্তির মাধ্যমে চিন্ময়ী মায়ের আরাধনা করা। আজ পৃথিবীর কোটি কোটি হিন্দু এই তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী। রামকৃষ্ণ মিশন এবং আপনাদের বেদান্ত মঠ থেকে এই মাতৃ-আরাধনা তত্ত্ব বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে বড় আকারের একটি শূণ্য। নবী মহম্মদের দর্শনের অবস্থান ঠিক এর বিপরীত মেরুতে। ওখান থেকে কামিনী-কাঞ্চন বাদ দিলে পড়ে থাকে আরও বড় আকারের একটি শূণ্য। সেই মহম্মদকে আপনারা বলছেন 'মহাত্মা'। তাঁকে মহাত্মা বলে চিহ্নিত করে রামকৃষ্ণ অনুসারী সাধু-সন্ন্যাসী-মনীষীদের 'দুরাত্মা' বলে ফেললেন না তো?

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী, ২০০৪-এর মার্চ মাসে আপনার লেখা নিবেদনটি ঐ বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় কি করে স্থান পেল? এর চেয়েও বড় কথা ঐ পুস্তিকায় ২০০৫-এর মে মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ও-বি-সি সংবাদ' থেকে কি করে তথ্য সংগ্রহ করলেন আপনারা? কোন যাদু আছে কি আপনাদের হাতে? এটাকেও আমরা বড় করে দেখছি না এই কারণে যে, একটুখানি ঘুরিয়ে হলেও আপনারা 'ও-বি-সি সংবাদে' প্রকাশিত নবীজীর ১২-টি বিয়েকে মেনে নিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ও-বি-সি সংবাদে প্রকাশিত চিঠিটির লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি এই চিঠির অন্যতম প্রেরক।

আপনার অবগতির জন্য আরও জানাচ্ছি, ঐ সময় আরবে শুধু পুরুষেরই নয়, মেয়েদেরও একাধিকবার বিয়ে হত। বিবি খাদিজার ৩য় বা ৪র্থ স্বামী হলেন 'মহাত্মা' নবী মহম্মদ। বিবি খাদিজার পূর্ববর্তী স্বামীদের নাম হচ্ছে —

১। আবু হাওলা,

২। আতীক ইবনে আয়েদ বা জায়েদ এবং

৩। সাইফী ইবনে উমাইয়া। (এই ৩-য় বিয়ে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।)

(সূত্রঃ বেগম নার্গিস জেরিনা খানের 'হযরত খাদিজা', বাংলা-১৪০০, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা -৭, পৃ-৩৫-৩৮)

স্বামীজী মহারাজ, নবীজী নিজে ৮ জন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এদের মধ্যে খাদিজা ছিলেন ২ বা ৩ বারের বিধবা। সেই নবীজী কিন্তু কড়া ফতোয়া জারি করে

গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন স্ত্রীকে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। এই ফতোয়া অনুসারে ১৭ বছর বয়সের ভরা যৌবনবতী আয়েশাকে প্রায় ৩৯ বছর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এমত অবস্থায় আপনারা যারা এই নবীজীকে 'মহাত্মা' অভিধাযুক্ত করছেন, তাঁদের কিন্তু উচিত নবীজীর ঐ নীতি প্রথমে রামকৃষ্ণ-অভেদানন্দ অনুগামীরা এক্ষুণি যাতে অনুসরণ করেন তার ব্যবস্থা করা এবং এরই সঙ্গে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো উচিত যে, ভারতের সংবিধানে 'মহাত্মা' নবীজীর ঐ যুগান্তকারী বিবাহ-বিধান যেন যুক্ত করা হয়। যুগান্তকারী এই বিধানের মোদ্দা কথা হচ্ছে, একজন পুরুষ একই সঙ্গে চার জন স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারবেন। সেই সঙ্গে অগণিত দাসীকে নিজের মালিকানাভুক্ত করে ভোগ করতে পারবেন। আর যখনই ইচ্ছা হবে স্ত্রীদের মধ্যে ১, ২, ৩ বা চারজনকে তালাক দিয়ে নতুন ১, ২, ৩ বা ৪ জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালানো যাবে। এটা কি নবীজীর দিব্যজ্ঞান তথা দিব্য অনুভূতির উদাহরণ?

স্বামীজী, আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি, স্বামী অভেদানন্দ নিঃসন্দেহে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক অনেক পড়াশোনা করেছেন তিনি। অনেক লিখেছেন। তবে অন্যান্য সাধারণ হিন্দুর মতোই তিনি কোরান এবং হাদীস পড়া থেকে বিরত ছিলেন। তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের লেখা ইসলামের ইতিহাসও পড়েননি বলে আমাদের ধারণা, যদিও এই পুস্তিকায় ঐতিহাসিক প্লিনি, গীবন এবং কার্লাইলের নাম আছে। এখানে এই সন্দেহ জাগে যে, আমেরিকার যে গোষ্ঠী তাঁকে আলোচ্য বক্তৃতাটি দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্যই তিনি নবীজীর অবাস্তব গুণাবলী আবিষ্কার (Invention) করেছেন।

স্কটল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) 'হিরো অ্যাজ এ প্রফেট' শীর্ষক নিবন্ধটি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে আমাদের অনুমান। এই নিবন্ধটি ১৮৪০-এ প্রকাশিত কার্লাইলের 'On Heroes and Hero Worship and the Heroic in History' শীর্ষক গ্রন্থের অংশ। ইসলামের পরম ভক্ত হিসেবেই তিনি ঐ নিবন্ধটি লিখেছেন। তবে কার্লাইল সাহেব এবং প্লিনি, গীবন নবীজীর ১২-টি বিয়ের কথা উল্লেখ করেননি — এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। সেক্ষেত্রে অভেদানন্দজী কেন নবীজীকে 'প্রায় অহিংস ব্রহ্মচারী' সাজাতে গেলেন?

মুসলমান এবং খৃষ্টানদের লেখা প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে নবী মহম্মদের ১২-টি বিয়ের কথা উল্লেখ করা আছে। সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে একজন মুসলমানও আপনি খুঁজে পাবেন না, যিনি এই তথ্য অস্বীকার করবেন। এই বহু আলোচিত তথ্যটি না জানা অভেদানন্দজীর পক্ষে এবং আপনার পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের নয়।

যাক, পুস্তিকাটির ১৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে নবীজীর জন্ম হয় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট। আমরা জানি তিনি জন্মেছিলেন ঐ বছর ২০ এপ্রিল, হিজরী হিসেবে ১২ রবিউল আউয়াল। ১৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, নবীজী অর্থলোলুপ ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য সেদিন (৬২২ থেকে ৬৩২ পর্যন্ত) তাঁর হাজার হাজার টাকার, আজকের

মাপকাঠীতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। সেই টাকা সেদিন চাঁদা হিসেবে কেউ দেননি। আর মদিনায় নবীজীর কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল না। বিবি খাদিজা তার আগেই এন্তেকাল করেছেন। তাহলে তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন ঐ টাকা? যে কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসে এ প্রশ্নের উত্তর আছে। এ ছাড়া ইন্টারনেটে 'গুগলীতে' (google) গিয়ে www.faithfreedom.org-এ সার্চ করলেও অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন।

অভেদানন্দজী ইচ্ছে করলে আমেরিকায় নবী মহম্মদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার আগে কোরান-হাদিস পড়ে নিতে পারতেন। কারণ, তাঁর আমেরিকা যাত্রার (১৮৯৬) আগেই কোরানের দু'টি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল[১]। এবং তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৩৪ পর্যন্ত আরও ৫ খানা ইংরেজী কোরান প্রকাশিত হয়েছে।[২] এ ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত কোরান।

ইসলামের ইতিহাসের উপর অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হচ্ছে উইলিয়াম ম্যুরের 'লাইফ অব মাহমেট'। ১৮৯৪ পর্যন্ত এর ৩-টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬১ সালে। এ ছাড়া ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৭-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে Elliot & Dowson-এর 'The History of India As Told By Its Own Historians'। মোট ৮ খণ্ডে। ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয়েছে Thomas Patrick Hughes-এর 'ডিকশনারী অব ইসলাম'। এ সব পড়ে তিনি ইসলামের স্বরূপ, নবীজীর চরিত্র এবং ভারত আক্রমণকারী মুসলমানের বর্বরতা এবং কু-কীর্তির কথা জানতে পারতেন। নিদেন পক্ষে কোরান-হাদিসের মূল বক্তব্য জেনে নিতে পারতেন। যেমন জেনে নিয়েছিলেন তাঁর অগ্রজপ্রতিম স্বামী বিবেকানন্দ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অভেদানন্দজীর চেয়ে ৪০ বছরের বড় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ওরফে মূল শঙ্কর তেওয়ারীও (১৮২৪-১৮৮৩) কোরান পড়েছিলেন এবং যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে কোরানের সমালোচনা করেছেন। কোরান পড়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ, যিনি অভেদানন্দজীর চেয়ে মাত্র ৬ বছরের ছোট ছিলেন (১৮৭২-১৯৫০)।

এ সব গ্রন্থের মধ্যে একখানাও যে অভেদানন্দজী পড়েননি, তার একাধিক প্রমাণ আছে আলোচ্য পুস্তিকায়। ২৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "মহম্মদ কেবলমাত্র একজন উৎসাহী ধর্মগুরুই ছিলেন না, ঈশ্বর কর্তৃক তিনি **স্বজাতির কাছে** ধর্মপ্রচারের জন্যও আদিষ্ট হয়েছিলেন।" কিন্তু কোরানের একাধিক জায়গায় অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে 'কোরান পৃথিবীর সব মানুষের জন্য'। তাই আজকের পৃথিবীর প্রায় সব মুসলমান প্রত্যেকটি অমুসলমানকে মুসলমান বানাবার জন্য ব্যস্ত।

এখানে প্রশ্ন জাগে, আমরা হিন্দুরা এ সব বুঝতে যাচ্ছি না কেন? এর সঠিক কারণ বলা কঠিন। তবে আমাদের বিশ্বাস, এটা ভারতীয় বা হিন্দু দর্শনের ত্রুটি। কোনো এক অশুভ মুহূর্তে দার্শনিক নামধারী কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন, **'আপ ভাল তো জগৎ ভাল'। অনেক নিরামিষাশী সাধু-বাবাজীদের বলতে শুনেছি, তুমি নিরামিষ খাও, দেখবে বাঘ-সিংহও তোমার কাছে আসবে না। তাঁদের বিশ্বাস, বাঘ বা সিংহ গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারে কোন ব্যক্তি আমিষাশী এবং কোন ব্যক্তি নিরামিষাশী। বাঘ-সিংহ আমিষভোজী**

বিধায় নিরামিষভোজী মানুষদের রক্ত-মাংসতে তাদের রুচি নেই। এ ছাড়া অনেক ব্রহ্মচারীদের বক্তব্য, গুরু চাইলে বিষও নাকি অমৃত হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই চরম মিথ্যা এবং অবৈজ্ঞানিক কথাগুলিকে জপের মালা করে নিয়েছেন আমাদের 'দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন' অনেক সাধু-বাবাজী। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের 'কাণ্ডজ্ঞান' কাজে লাগাতে যাননি। সম্ভবত এই কারণেই সমাজবিজ্ঞানী প্রয়াত শিবপ্রসাদ রায় বলেছেন, 'দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই'। ভারতের দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন অধিকাংশ ব্রহ্মচারী-যোগীবাবারা আমাদের বাঁচার মন্ত্র না শিখিয়ে একালে তাঁদের চরণসেবা এবং পরকালে বৈকুণ্ঠ লাভের তত্ত্ব শেখাচ্ছেন। আমরা দেখে অবাক হচ্ছি, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মহাপ্রভুর কোনো কোনো শিষ্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির জন্য তাবিজ (ব্যাজ) বিক্রী করছেন। (পরিশিষ্ট-গ) আমরা দেখে বিস্মিত হচ্ছি, ডকটরেট ডিগ্রীধারী এক অকৃতদার ব্রহ্মচারী তাঁর আশ্রম ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে ৩৬৫ দিন অহোরাত্র নাম কীর্তনের ব্যবস্থা করেও 'মহাত্মা' নবীর অনুগামী ইয়াহিয়া বাহিনীর গুলির হাত থেকে তাঁর একান্ত ভক্ত ৮ জন ব্রহ্মচারীকে বাঁচাতে পারেননি। এমনকি তখন শ্রীঅঙ্গ নে গিয়ে ব্রহ্মচারীদের মৃতদেহ দেখার চেষ্টাও করেননি। তবুও কেন তিনি তাঁর আমেরিকায় দেওয়া অমৃত বাণী, ইসলাম শব্দের তাৎপর্য 'I Shall Love All Mankind' তত্ত্বে অটল থাকেন? ব্রহ্মচারীজী ঐ ৮ জন ব্রহ্মচারীকে 'শহীদ' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং স্তুতিমূলক একটি কবিতা লিখলেন। এ কাজ করে মহানামব্রতজী 'শহীদ' শব্দটির (নির্ভেজাল আরবী শব্দ) অপ-প্রয়োগ করেছেন। ইসলামী মতে বিধর্মী নিধনের যুদ্ধে (জেহাদে) গিয়ে যারা মারা যায়, তাদের শহীদ বলা হয়। বাংলা ভাষায়ও 'শহীদ' শব্দটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন, শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ ভগৎ সিং ইত্যাদি। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহিরাগত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। জগদ্বন্ধুর নাম কীর্তন এবং ক্ষুদিরাম ও ভগৎ সিং-এর কাজ কি একই ধরনের ছিল? আসলে ঐ ৮ জন ব্রহ্মচারী যা করেছেন তার শুদ্ধ নাম 'স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা', ভাষান্তরে 'আত্মহনন'। আমাদের অধিকাংশ ব্রহ্মচারী সাধু-বাবাজীরা কার্যত আমাদের আত্মহননের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। জানিনা, মোক্ষলাভের এটাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ কিনা। তবে যদি কোনোদিন প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিদেশী অপশক্তির অঙ্গুলী হেলনে ভারত নামক হিন্দু-প্রধান রাষ্ট্রটিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে আত্মহননে উদ্বুদ্ধ করছেন, তাহলে অবাক হব না।

আসুন, মহানামব্রতজী তাঁর ভাষায় অষ্টশহীদদের উদ্দেশে ঠিক কি বলেছেন তা' দেখে নিই।

জয় জগদ্বন্ধু হরি, জয় শহীদ অষ্ট ব্রহ্মচারী

শ্রীকীর্ত্তনব্রত কানাই চির-গৌর-রবি।
ক্ষিতি নিদান বন্ধু দাস ত্যাগ ব্রতী সবি।।
শহীদ হলে হাসি মুখে প্রাণ দান করি।
ধন্য মোরা তোমাদের গুণগাথা স্মরি।।

বৈশাখে সপ্তম দিনে সন্ধ্যা সমাগমে।
পুত চিত্তে ছিলে সবে মগ্ন মহানামে।।
হেনকালে শ্রীঅঙ্গনে বজ্রনাদে পশি।
হানাদার ক্ষিপ্ত গুলি বিধিল নির্দোষী।।
একে একে আট জন পড়ে ভূমি তলে।
রক্তধারা বয়ে যায় চালতা বৃক্ষ মূলে।।
মানবতার অপমান আজি বিশ্ব জোড়া।
শত অত্যাচারিতের প্রতীক তোমরা।।
তর্পণ প্রায়শ্চিত্ত মোরা করিব সবার।
বিশ্বমাঝে হেন পাপ নাহি ঘটে আর।।
ওহে জগতের বন্ধু এই কৃপা ভিক্ষা।
সকল মানুষে দাও মনুষ্যত্ব শিক্ষা।।

— ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

লক্ষ করলে দেখা যাবে, পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীজী লিখেছেন, 'মানবতার অপমান আজ বিশ্বজোড়া'। এর জন্য দায়ী কে বা কারা? তাদের চিহ্নিত করে যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায়, তাহলে কোন 'বন্ধু' তো দূরের কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আমাদের বাঁচাতে আসবেন না। তিনি যদি মুসলমানের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে চাইতেন তাহলে নরপশু সুলতান মাহমুদ থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া খান হয়ে বেগম খালেদা পর্যন্ত হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছে, তা দেখে তিনি এসে হাজির হতেন। এমন অবস্থায় আমরা নিজেরা কীর্তন করতে করতে মানবতার অপমানকারীদের 'মনুষ্যত্ব শিক্ষা' দেবার জন্য যদি কোন বন্ধুর কাছে প্রার্থনা জানাই কিংবা হরেকৃষ্ণ নাম কীর্তনে মগ্ন থাকি, তাহলে হিন্দু ধর্মের বিলুপ্তি কেউ আটকাতে পারবে না।

৬১০ খ্রী. পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১ জন (নবী মহম্মদ)। পৃথিবীতে আজ হিন্দুর সংখ্যা ৯০ কোটির কাছাকাছি হবে হয়ত। পক্ষান্তরে মুসলমানের সংখ্যা ১৩০ কোটির বেশি। ১৯৫১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা নিম্নরূপ—

বছর	হিন্দুর সংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা
১৯৫১	৩০ কোটি ৩৬ লক্ষ	০৩ কোটি ৫৪ লক্ষ
১৯৬১	৩৬ কোটি ৬৫ লক্ষ	০৪ কোটি ৬৯ লক্ষ
১৯৭১	৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ	০৬ কোটি ১৪ লক্ষ
১৯৮১	৫৪ কেটি ৯৭ লক্ষ	০৭ কোটি ৫৫ লক্ষ
১৯৯১	৬৮ কোটি ৭৬ লক্ষ	১০ কোটি ১৬ লক্ষ
২০০১	৮২ কোটি ৭৫ লক্ষ	১৩ কোটি ৮২ লক্ষ

২০০১-এ ভারতে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে মুসলমান শিশুরা ছিল শতকরা ৩৩ জন। ২০১১-তে হিন্দুদের সংখ্যা ৯০ কোটির কাছাকাছি থাকবে এবং মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৭ কোটিতে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০ জন। আমরা মনে করি ইসলাম বা নবীজীর তোষণমূলক গুণকীর্তন করার আগে আমাদের উপরোক্ত পরিসংখ্যান জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আর এটা জানা তেমন কঠিন কাজ নয়।

পরম পুরুষ বা ভগবান হিসেবে বন্দিত রামকৃষ্ণদেবের আয়ুষ্কাল ছিল ৫০ বছর (১৮৩৬ - ১৮৮৬)। এই সময়কালের মধ্যে বাংলায় আরও অনেক ধর্মগুরু এবং যোগীপুরুষের অলৌকিক কাজকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা। এখানে আমরা দু'জন বাঙালি যোগীপুরুষের কথা উল্লেখ করব। একজন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং অপরজন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের কি লীলা, ইংরেজ রাজত্বকালে বাংলায় যত ব্রহ্মচারী এবং যোগীপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা প্রায় সকলেই (২/১ জন বাদে) বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তনয়।

ব্রাহ্মণ রামনারায়ণ-তনয় লোকনাথ ঘোষাল (১৭৩০-১৮৯০) বাংলার অন্যতম সাধু বা যোগী মহাপুরুষ। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের (উ.২৪ পরগনা) কচুয়ায়। আমরা অনেকে তাঁকে পূর্ববঙ্গের সন্তান বলেই জানতাম। কারণ, ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জের 'বারদি' গ্রামে 'মহাযোগী ব্রহ্মচারী' হিসেবে লোকনাথজীর আবির্ভাব (আগমন) এবং এখানেই তাঁর তিরোভাব। তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কোনো তথ্য আমরা পাইনি। তবে তাঁর নিজের হাতের লেখা একটি চিঠির হদিস দিয়েছেন কোনো এক ভক্ত। দীর্ঘায়ু (?১৬০ বছর) এবং দীর্ঘদেহী (প্রায় ৭ ফুট) এই সাধু পতঞ্জলী এবং হঠযোগে পারদর্শী হয়ে পায়ে হেঁটে হিমালয়, আফগানিস্তান, পারস্য, আরব এবং ইসরাইল ভ্রমণ করেছেন বলে ভক্তরা প্রচার করছেন। কেউ কেউ বলছেন তিনি কুমেরু এবং সুমেরুও ভ্রমণ করেছেন। এক ভক্তের বর্ণনায় দেখা যায়, লোকনাথজী কাবুলে গিয়ে আরবী ভাষা শিখেছেন এবং তার সঙ্গে 'কোরানও' পড়েছেন। তিনি মক্কা গিয়ে ৩ বার হজ পালন করেছেন বলে প্রচার করছে 'উইকিপিডিয়া ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া' (৩০.৪.২০১১)। কিন্তু আমরা জানি, একজন হিন্দুর পক্ষে মক্কা গিয়ে হজ পালন করার অধিকার কোনোদিন ছিল না; আজও নেই। একদল ভক্ত বাবাজীর জীবন নিয়ে সিনেমা করে দেখাচ্ছেন যে, উনি মক্কা গিয়ে ভারতের 'পুরাণ' দিয়ে ইসলামের 'কোরান' চেয়েছিলেন। এই ভক্তবৃন্দ কি জানতেন না যে, ঐ সময়ের অনেক আগেই ভারতে কোরান এসে গিয়েছিল এবং কোরানের বিধান অনুসারেই মুসলিম আক্রমণকারীরা হিন্দুদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল? ভক্তবৃন্দ আমাদের জানাচ্ছেন না যে, লোকনাথজী আসলেই সঙ্গে করে কোরান এনেছিলেন কিনা। যদি এনে থাকেন তাহলে তিনি কি কাজে লাগিয়েছিলেন ঐ কোরান? বাবাজী বলতেন দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হলে চাই বাক্ সংযম এবং যৌন সংযম। কোরানে তো এর বিপরীত কথাই আছে।

দীর্ঘদিন ধরে ভক্তবৃন্দ লোকনাথজীর রঙীন ছবি তৈরী করে নীচে 'ক্যাপশন' দিয়েছেন এইভাবে — 'রণে, বনে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমি-ই রক্ষা করিব।' 'পবিত্র' মক্কা থেকে আগত কোরানের বিধান আওড়াতে আওড়াতে ১৯৭১-

এ যখন বাংলাদেশে পয়গম্বরের সাচ্চা বান্দারা জগদ্বন্ধু, লোকনাথ বন্ধু এবং অন্যান্য বন্ধুর হাজার হাজার ভক্তদের কচু-কাটা করেছিল, তখন কোনো বন্ধুই আসেননি তাদের বাঁচাতে। ২০১০-এর ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার যোগীবাবার জন্মভিটা কচুয়ার অতি নিকটে দে-গঙ্গা এলাকায় 'মহাত্মা' পয়গম্বরের সাচ্চা বান্দারা এক হাজী সাহেবের নেতৃত্বে ২০ কি.মি. দীর্ঘ এবং ৫ কি.মি. বিস্তৃত এলাকায় বেছে বেছে হিন্দু বাড়িতে আগুন দিয়েছে, হিন্দু মন্দির ভেঙেছে, সেখানে প্রস্রাব করে অপবিত্র করেছে, হিন্দুদের বসত বাড়ি এবং দোকান থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করেছে এবং তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লোকনাথের কয়েক শ' ছবি পুড়িয়ে দিয়েছে (পরিশিষ্ট-ক দেখুন)। তখনও কিন্তু কোনো সিদ্ধ পুরুষ ঐ হিন্দুদের বাঁচাতে আসেননি। স্বামী বিবেকানন্দের কিংবা স্বামী প্রণবানন্দের আসার কথা নয়। কারণ, তাঁরা কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। বিবেকানন্দজী আমাদের প্রত্যেককে এক একজন গুরু গোবিন্দ সিং হতে বলেছিলেন। প্রণবানন্দজী আমাদের শক্তিশালী হতে বলেছিলেন। আমরা এসব কথায় কান না দিয়ে কেউ কেউ মহাপ্রভুর নাম-কীর্তন এবং রাসলীলা নিয়ে মত্ত ছিলাম। কেউ কেউ 'মা মা' বলে অঝোরে কাঁদতে ছিলাম। তবে বাবা লোকনাথ কিংবা পরমহংসদেবের পরমারাধ্যা মা-কালী কেন এলেন না, তা বুঝতে পারলাম না। কেনই বা 'সর্বধর্ম সমন্বয় কি জয়' ধ্বনিতে মুখর পরম পুরুষ দুর্গাপ্রসন্ন মহারাজের কোনো শিষ্যকে সেদিন দে-গঙ্গায় যেতে দেখলাম না?

বাংলার যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী (১৮২৬-১৮৯৫) ছিলেন ক্রিয়াযোগের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম নদীয়ার ঘূর্ণি গ্রামে। তবে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন কাশীতে। সন্ন্যাস নয়, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেছেন। সরকারী চাকুরী করেছেন। এ সবের মধ্যেই যোগবিদ্যা সাধনা করে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ঘোষণা করেছেন, "আমিই কৃষ্ণ, আমিই মহাদেব, আমিই নারায়ণ। আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। আমি যা' বলি তাই বেদ। আমার অজানা কিছু নেই।" (উইকিপিডিয়ায় প্রচারিত প্রবন্ধ থেকে) গবেষক-লেখক যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) তাঁর 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য'-তে (১৯৮৫, পৃ-১১৬) জানাচ্ছেন, চাকুরী জীবনে এই মহাযোগী যোগবলে লণ্ডনে গিয়ে তাঁর চাকুরী দাতা ইংরেজ বসের দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ক'জন ভারতীয়কে নিরাময় করেছেন, তা জানতে পারিনি আমরা। জানতে পারিনি তাঁর ৬৮ বছরের জীবনে খ্রীষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের হাত থেকে ভারত এবং ভারতবাসীকে বাঁচাবার জন্য তাঁর 'যোগবিদ্যা' কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। বাবা লোকনাথ এই যোগীরাজকে বড্ড ভালবাসতেন। এই সব পরম শ্রদ্ধাস্পদ যোগী মহারাজবৃন্দ যদি যোগবলে ইসলামের আসল রূপ এবং মুসলিম আক্রমণকারীদের কু-কর্মগুলি জেনে নিয়ে প্রচার করতে পারতেন তাহলে পথিবীর হিন্দু এবং বৌদ্ধদের এমন দুর্গতি হত না।

আচ্ছা মহারাজ, আপনারা তো বছরের পর বছর ধরে হিন্দুদের বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে

আসছেন। বেদান্তে শিক্ষিত সেই সব 'বৈদান্তিক' মহাপুরুষেরা দে-গঙ্গা গিয়েছিলেন কি একবারের জন্যও?

মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করেন না, এমন কোনো মাতাজী বা বাবাজী সম্ভবত ভারতে নেই। কিন্তু ২/১-টি সংগঠন ছাড়া কেউই বাংলার তৎকালীন নবাব হোসেন শাহের কাজীর বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর তীব্র আন্দোলনের কথা মুখে আনেন না। বাসুদেব সার্বভৌম কেন নদীয়া ছেড়ে উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, তা ভুলেও উচ্চারণ করেন না। মহাপ্রভুই বা কেন সন্ন্যাস গ্রহণের পরে উড়িষ্যা গিয়ে মৃত্যুর আগে একদিনের জন্যও নদীয়া এলেন না, একথাও উচ্চারণ করেন না কোনো বৈষ্ণব। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার একদল বৈষ্ণব নদীয়ার কাজীর বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর আন্দোলনকে 'কাজী উদ্ধার' বলে প্রচার করছেন। নবাব হোসেন শাহের ঐ কাজী তো সেদিন সাময়িক ভাবে পিছু হটেছিলেন মাত্র। এর মধ্যে 'উদ্ধার' বা 'অনুদ্ধারের' প্রশ্ন আসে কি করে?

এখানে আপনি বলতে পারেন, 'আমরা বৈষ্ণব নই। যারা বৈষ্ণব তাঁদের কাছে যান।' মহারাজ, আপনারা বৈষ্ণব না হলেও ইসলাম সম্পর্কে 'অজ্ঞতা' প্রসঙ্গে আপনাদের এবং বৈষ্ণবদের অবস্থান তো একই অক্ষ রেখায়।

আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনারা ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে এসে আলোচ্য নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে? বিগত ৫০ বছরের মধ্যে কোরান-হাদিসের একাধিক নির্ভরযোগ্য অনুবাদ (ইংরেজী এবং বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। আপনি বা আপনারা ইচ্ছে করলেই এগুলো পড়ে নিতে পারেন। যাঁদের ইন্টারনেট আছে তাঁরা তো প্রায় বিনা খরচেই পড়তে পারেন। তা না করে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করে হিন্দুদের অনেক ভুল তথ্য দিয়েছেন। এর ফলে আপনারা হিন্দুদের ক্ষতি করলেন বলে আমরা মনে করি। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটিতে না পাবেন রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক প্রধান নবীজীর পরিচয়, না পাবেন ধর্মপ্রবক্তা নবীজীর আসল পরিচয়। মুসলিম তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে নবীজী নিজে কয়েক হাজার উপদেশ দিয়েছেন, যা সংকলিত হয়েছে হাদিস সংকলন গ্রন্থে। এগুলো হচ্ছে তাঁর সরাসরি উপদেশ। এ ছাড়া 'খোদার বাণী' বলে কথিত কোরানের ৬৬৬৬-টি বিধান (আয়াত) হচ্ছে বিশ্ববাসীর কাছে নবীজীর চরম উপদেশ। এই সব উপদেশের কণামাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ৩৩ নং পৃষ্ঠায়। যেমন —

১। 'নবীজী একমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করতে বলেছেন; মূর্তি পাথর প্রভৃতির পূজা করতে নিষেধ করেছেন।'

(মূর্তি বা পাথর পূজারীর জন্য খোদা এবং নবীজী যে শাস্তির বিধান দিয়ে গেছেন, তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই এই পুস্তিকায়।)

২। 'একমাত্র ঈশ্বরকেই মান্য করতে বলেছেন। অন্য কাউকে তাঁর সমমর্য্যাদা দিতে নিষেধ করেছেন।'

(এই বিধান অমান্যকারীর কপালে যে দুর্ভোগ আছে, সে কথা উহ্যই থেকে গেছে।)

৩। 'সত্যভাষণ ও অপরের গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করতে, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি

স্নেহভাজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হতে বলেছেন।'

(সভ্য পৃথিবী 'সত্যভাষণ' বলতে যা জানে, নবীজী সেই 'সত্যভাষণের' কথা কোনদিন বলেননি। তিনি বলেছেন, কোরান-হাদিসে বর্ণিত সত্যই একমাত্র সত্য। এর বাইরে কোন সত্য নেই।)

৪। 'কু-কার্য, লাম্পট্য ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ বর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন।'

ইসলামের দৃষ্টিতে কু-কার্য এবং লাম্পট্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা। আর রক্তক্ষয়ী বিবাদ? নবীজী একজন মুসলমানের সঙ্গে আর একজন মুসলমানের রক্তক্ষয়ী বিবাদ করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে বিধর্মীদের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী বিবাদে লিপ্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পবিত্র ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কায়েম (বাস্তবায়িত) না হয়। কোরানের ভাষায়, —

"হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩) " ..... এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হইয়া যায়। ..... " (৮:২৯)

খোদার এই নির্দেশের যে পরিপূরক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহানবী যা মহা মূল্যবান তথ্য হিসেবে হাদিস সহি মুসলিমে স্থান পেয়েছে।[৩]

চুরি করা এবং অবৈধ যৌন সহবাস করা নিশ্চয়ই কু-কার্য এবং লাম্পট্য। জিব্রাইল বা গ্যাব্রিয়েল কিন্তু নবীজীর কাছে এসে বলে গেছেন, একজন মুসলমান যদি তার সমগ্র জীবনে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও উপাসনা না করে তাহলে সে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাবে, চুরি বা অবৈধ যৌনসহবাস করলেও।[৪]

এমনিতে একজন মুসলমান পুরুষ তার বিবাহিতা স্ত্রী এবং মালিকানাধীন দাসী ছাড়া আর কারও সঙ্গে যৌনসহবাস করতে পারবে না। কিন্তু একজন মুসলমান সৈনিক তা পারবে। যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের মহিলাদের ধরে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে যৌনসহবাস করতে পাবে, যদি ঐ মহিলা রজঃস্বলা এবং সন্তানসম্ভবা না থাকে।[৫] 'মহাত্মা নবীজীর (হাদিসের) অমর বাণী বটে!

যুদ্ধবন্দী হিন্দু মহিলাদের সংগে যৌন সহবাস করা তো জলভাতের মতো ব্যাপার। ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে আটকে রাখা মহিলাদের উপর যে ধরনের যৌন অত্যাচার করা হত তা' প্রকাশের যথাযথ ভাষা আমাদের নেই। তবে প্রয়াত অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম অনেকটাই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' শীর্ষক গ্রন্থে। একটু সময় করে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখবেন, স্বামীজী। সেদিন ঐ হতভাগিনীদের প্রাণ এবং ইজ্জত বাঁচাবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশির্বাদ ধন্য কোনো বাবাজী-মাতাজী বা ব্রহ্মচারীজীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এক ব্রহ্মচারী ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ থেকে ভারতে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তরা প্রচার করছেন, উনি এখানে এসে অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে দীর্ঘদিন 'শস্যাহার' না করে 'ফলাহার' করেছিলেন।

৫। নবীজী স্ত্রীজাতির প্রতি সন্দিগ্ধ হতে নিষেধ করেছেন। কোথায় এ কথা বলেছেন, তা আমাদের জানা নেই। অভেদানন্দজীও উল্লেখ করেননি। তবুও ধরে নিচ্ছি নবীজী এ কথা বলেছেন। কিন্তু নবীজী এর উল্টো যে সব কথা বলেছেন, তা-ও পাঠকদের জানা উচিত। আমরা এখানে দু'চারটি মাত্র উল্লেখ করছি।

ক) নামাজের সময় সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, কুকুর এবং বানর হেঁটে গেলে নামাজ বরবাদ হয়ে যাবে। বুখারী, ১/৪৯০।

খ) যে জাতির শাসন কর্তা মহিলা সে জাতির উন্নতি নেই।
বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং-৭০৯।

গ) নারীজাতির চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছু নেই।
বুখারী, ৭/৩৩ নং হাদিস।

ঘ) এক সঙ্গে দুই, তিন বা চারজন বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে যত সংখ্যক খুশি মালিকানাধীন দাসীর (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধে প্রাপ্ত) সঙ্গে যৌনসহবাস বৈধ।
— কোরান- ৪/৩ এবং ২৩/১-৬

ঙ) 'স্বামী তাহার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করিতে পারে —
(১) স্ত্রীকে সাজসজ্জা করিয়া তাহার নিকট আসিতে বলার পর স্ত্রী তাহা অমান্য করিলে ।
(২) সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামীর আহ্বান পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করিলে।
(৩) স্ত্রী ফরজ গোসল ও নামাজ পরিত্যাগ করিলে।
(৪) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারো বাড়িতে বেড়াইতে গেলে।'
(মিসকাত আল-মাসাবি)

চ) একজন মুসলমান তার স্ত্রীকে কেন পিটিয়েছে, শেষ বিচারের দিনে সে কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না। — সুনান আবু দাউদ, ১১/২১৪২

ছ) নবীজী নরকে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। — বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদিস নং - ৩৯

ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম 'কোরান'। আপনাদের এই পুস্তিকাটিতে দু'বার মাত্র কোরান শব্দটির উল্লেখ আছে ২৬ নং পৃষ্ঠায়। এখানে বলা হয়েছে, "সুন্দর আরবীতে লেখা আধ্যাত্মিক আলোকে ও জ্ঞানে পূর্ণ 'কোরাণ' তিনি তাঁর স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে পাঠ করে শোনাতেন।" কোরান কতটা 'আধ্যাত্মিক আলোকে ও জ্ঞানে পূর্ণ' তার খানিকটা পরিচয় তুলে ধরা হল। এর নাম আধ্যাত্মিক আলো এবং জ্ঞান? আমাদের দৃষ্টিতে এর নাম কু-জ্ঞান, যা আজ সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে অভেদানন্দজী বেছে বেছে কয়েকটি নিরামিষ উপদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে 'চরম অশান্তি সৃষ্টিকারী' হাদিস সমূহ বাদ দিয়েছেন তিনি, হয় অচেতন ভাবে, নয়ত ইচ্ছাকৃত ভাবে।

আমরা এখানে নবীজীর অশান্তি সৃষ্টিকারী কয়েকটি উপদেশ উল্লেখ করছি —

১। এই বিশ্ব ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বা খোদা। তিনি নিরাকার, অবিবাহিত। তিনি কারও মা বা বাবা নন। তাঁর নিজেরও মা বা বাবা নেই। এই খোদার কোনো অংশীদার নেই। তিনি কয়েকজন ফেরেশ্তার মাধ্যমে এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন। যে বা যারা বলবে যে, খোদার অংশীদার আছে, সে বা তারা খোদার শত্রু এবং একই সঙ্গে নবীজীরও শত্রু।

২। ইসলাম আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম স্বীকার করেন না খোদা বা আল্লাহ্।

৩। ইসলামী স্বর্গের নাম 'জান্নাত' এবং ইসলামী নরকের নাম 'দোজখ'। একজন মুসলমান যত পাপই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে স্বর্গে যাবে। কিন্তু অমুসলমানরা, বিশেষত মূর্তি পূজারীরা কোনোমতেই স্বর্গে যেতে পারবে না। অনেক হিন্দুই জানে না যে, হিন্দুসহ সব ধর্মের মানুষেরই বিচার করবেন খোদা তাঁর কোরানের বিধান অনুসারে। আমরা হিন্দুরা ইসলাম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতার কারণে বলি, কোরান মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ; আমাদের নয়। আমরা বলি, পরকালে খোদা কেবলমাত্র মুসলমানদেরই বিচার করবেন। আসলে নবী এবং খোদার সুস্পষ্ট বিধান হচ্ছে, পরকালে পৃথিবীর সব মানুষেরই বিচার করবেন খোদা। ঐ বিচারসভায় ওকালতি করবেন নবীজী নিজে। তবে যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে মারা যাবে, তাদের বিচার হয়েই আছে। তাদের সরাসরি ইসলামী নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইহকালে তারা যে সব দেব-দেবীর পূজা করবে, তাদের ব্যবহার করা হবে ইসলামী নরকের জ্বালানী হিসেবে।

৪। মূর্তি পূজারীরা চিরদিনের জন্য অপবিত্র (কোরান-৯/২৮)। তাকে পবিত্র হতে হলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ পর্যন্ত সব হিন্দুই অপবিত্র হিসেবে মারা গেছেন। আপনাদের বিচারে তাঁরা রামকৃষ্ণলোকে গেলেও 'মহাত্মা' (?) পয়গম্বরের বিধানে তারা নরকে গেছেন বা যাবার জন্য কোথাও তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নবীজীর মা-বাবা, ধাই-মা এবং চাচা আবু তালেব সহ নবীজীর পূর্বপুরুষদের সবাই ইসলামী নরকে যাবেন বা গিয়েছেন। নবীজীর বাঁচা এবং বেড়ে ওঠার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর চাচা আবু তালেব, অভেদানন্দজীর ভাষায় যিনি ছিলেন নবীজীর শৈশবের অবলম্বন, যৌবনের অভিভাবক এবং পরিণত বয়সের আত্মরক্ষার উপায় (আলোচ্য পুস্তিকার পৃ-৩৫-৩৬)। সেই আবু তালেবও স্বর্গে যেতে পারেননি। তাঁর স্থান হয়েছে নরকে। নবীজীর চাচা বিধায় তাঁর শাস্তি হয়েছে কিছুটা লঘু। তাঁর পায়ে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা হবে, যার ফলে তাঁর মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এখন চিন্তা করুন শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বুদ্ধ, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ সহ যত হিন্দু বা অন্য ধর্মের মানুষ

মারা গেছেন, তাদের কি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে!

ইসলামে অহিংস হওয়া, বিয়ে না করে কৌমার্যব্রত পালন করা কিংবা ব্রহ্মচর্য পালন করা নিষিদ্ধ।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমান ক্রীতদাস একজন চরিত্রবান মূর্তিপূজারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ভাই। নবীজী জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও বলতে পারলেন না যে, এক মানুষ আর এক মানুষের ভাই।

খোদার বিধান কোরান অনুসারে যে বিচার ফয়সালা করে না সে কাফের (৫/৪৪)। খোদা বলেছেন, "... এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা *(বিবাদ)* খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন *(ধর্ম)* পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হইয়া যায়। ....." (২:১৯৩)

ইসলামের চোখে সবচেয়ে পুণ্যের কাজ হল জেহাদে অংশ গ্রহণ করা। জেহাদ পরিচালিত হবে কেবলমাত্র বিধর্মীদের বিরুদ্ধে। মুসলমানরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর যে কোন প্রকার অত্যাচার চালাতে পারবে। যেমন, ঘর-বাড়িতে আগুন লাগানো, জলপ্লাবন ঘটানো, গাছ-পালা কেটে ফেলা, খাদ্য-শস্য নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি। [Dictionary of Islam by T.P. Hughes, 1999, pp-243 & 245]

১৯৭১-এ বাংলাদেশে এর সবটাই করা হয়েছিল।

জেহাদে মৃত্যু হলে ঋণ করার পাপ ছাড়া বাকি সব পাপ খোদা মাফ করে দেবেন। খোদার পথে যুদ্ধ করা ধর্মীয় কর্তব্য। যখন কোন ইমাম যুদ্ধে ডাক দেবেন, তখন মুসলমানদের যুদ্ধে যেতেই হবে। জেহাদে যোগ দিলে ইহকালে বস্তুগত প্রাপ্তি এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি অবধারিত। জেহাদ পুণ্যতম কাজ। অন্য কোন কাজের সমকক্ষ নয়। জেহাদ হজ করার চেয়ে পূণ্যতম। নবী মহম্মদ তাঁর মদীনাবাসের ১০ বছরের মধ্যে ৮২ বার জেহাদ করেছিলেন। এর ২৬ টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। জেহাদে যিনি জয়ী হন তিনি গাজী উপাধি পান। ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে একজন বিধর্মী হত্যা করতে পারলেই সে গাজী উপাধি পায়। মিশকাত শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে টি. পি. হিউজ তাঁর 'দি ডিকশনারী অব ইসলাম'-এ (পৃ-১৮৯) গাজীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায় — " One who fights in the cause of Islam. .... One who slays an infidel."

বাংলাদেশের বেগম খালেদার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পোষা গুণ্ডারা হিন্দু বৌদ্ধ আদিবাসীদের মতো মূর্তি পূজারীদের খুন করে ধনী হয়েছে, যৌন তৃপ্তি লাভ করেছে এবং সর্বোপরি 'গাজী' হয়েছে। এর সঙ্গে পরকালে কয়েক গণ্ডা পিনোন্নতা হুরীদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে অনবরত ক্লান্তিবিহীন যৌন সহবাস করার সুযোগ তো আছেই।

আল্লাহ্‌র বক্তব্য অনুসারে 'ইসলাম ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র মহাসত্য'। নবী মহম্মদের সময় আল্লাহ্ এই মহাসত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন এবং নবীকে বলেন— "আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য পৌত্তলিকদের আমন্ত্রণ

জানাও .... তারা যদি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর দাবী কর ..... তারা যদি এই কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" ৬

অভেদানন্দজী ৩৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'মদিনায় মহম্মদ একটি জমি ক্রয় করে সেখানে উপস্থিত হওয়ার সাত মাসের মধ্যে সেখানে তাঁর প্রথম মসজিদ বা উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করেন। ...... মহম্মদ তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি মদিনাতেই অতিবাহিত করেন এবং সেই সময়ে তাঁর আরও দিব্য অনুভূতি হয়েছিল'। নবীজী মদিনায় জমি ক্রয় করেছিলেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু মদিনাবাসের ১০ বছরের মধ্যে ৮২-টি যুদ্ধে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন, একথা আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। তারই সূত্র ধরে বলছি, কোরান থেকে যুদ্ধের কথা বাদ দিলে তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আর দিব্য অনুভূতির অর্থ যদি হয় মূর্তি পূজা এবং মূর্তি পূজারীদের নির্মূল করা, ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করা, পররাজ্য জয় করা এবং বিয়ের পর বিয়ে করে যাওয়া, তবে মদিনাবাসের ১০ বছরের মধ্যে নবীজীর অবশ্যই 'আরও দিব্য অনুভূতি' হয়েছিল। এই নিরিখে বলা যায়, আমাদের হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের কারও কোনোদিন দিব্য অনুভূতি হয়নি। এমনকি মহামানব বুদ্ধদেব এবং ভগবান রামকৃষ্ণদেবেরও নয়।

।। নবীজীর যুদ্ধ নীতি।।

মদিনায় গিয়ে নবীজী অল্পদিনের মধ্যে ধনে, মানে এবং সামরিক সম্ভারে একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। তারপর একদিকে তিনি ধর্মগুরু হিসেবে ইসলাম প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। এবং অপরদিকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করা শুরু করেন। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্মই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মহাসত্য। এ কথাটি তিনি আল্লাহ্‌র বাণী বলে প্রচার করলেন। এটি কোরানের ৮/৫৫ নং আয়াতে স্থান পেয়েছে — 'এই মহাসত্য যারা প্রত্যাখান করবে তারা হবে পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল জন্তু প্রাণির মধ্যে নিকৃষ্টতম।' তিনি প্রচার করা শুরু করলেন যে, কোনোদিন মুসলমানরা অমুসলমানের কাছে পরাজিত হবে না।

মদিনায় থাকাকালীন সময়ে নবীজী অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবলেন এবং চরম আত্মবিশ্বাসী হলেন। এবং বিশ্বজয়ের উদ্দেশ্যে 'সৃষ্টি ছাড়া যুদ্ধ নীতি' উদ্ভাবন করলেন। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ৬২৮ খ্রী. তিনি রোম, আবিসিনিয়া, মিশর, পারস্য, সিরিয়া, বাহ্‌রাইন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সম্রাটের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। প্রথমেই তিনি তৎকালীন রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে দূতের মাধ্যমে নিম্নোক্ত চিঠিটি পাঠালেন

"বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম,

আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাহার রাসুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে —

যে সত্য পথ অনুসরণ করে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে 'ইসলাম' গ্রহণের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ থাকিবেন।

ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি ইসলামের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনি আপনার প্রজাকুলকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য পাপী হইবেন। আমি আপনাকে আল্লাহ্র বাণী শোনাইতেছি :

"হে গ্রন্থধারিগণ! এসো, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি ঃ আমরা কেহই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিব না এবং আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব না। যদি তারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকিও।" (কোরান- ৩/৬৪)

মোহর ঃ মুহম্মদ-রসুল-আল্লাহ্।

আপাত নিরীহ এই চিঠিটিতে যে পরোক্ষ হুমকি আছে তা অনুধাবন করে সম্রাট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। চিঠিটির ইংরেজী এবং আরবী ভাষ্যের জন্য বুখারী শরীফের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৬০ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

নবীজী অনুরূপ একটি চিঠি লেখেন পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট। চিঠিটি পেয়ে সম্রাট রেগে আগুন হয়ে যান এবং এটি ছিঁড়ে ফেলেন। এবং নবীজীকে বন্দি করে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু নবীজীকে বন্দি করতে পারলেন না। পরিবর্তে নিজের পুত্র শেরওয়া কর্তৃক নিহত হন। নতুন সম্রাট হন বাজান। তিনি সব শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দেখাদেখি অনেক অগ্নি উপাসক মুসলমান হয়ে যান।

নবীজী ৩য় চিঠিটি লিখেছিলেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে। মূল বক্তব্য একই - ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকুন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। চিঠি পেয়ে নাজ্জাশী বশ্যতা স্বীকার করেন এবং এর নিদর্শন স্বরূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরী নাম্নী দুইটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া খ্রীষ্টান মহিলা এবং তার সঙ্গে সাদা রং-এর দুষ্প্রাপ্য ঘোড়া উপহার দেন। নবীজী মেরীকে নিজে রেখে দেন এবং শিরীকে কবি হাসানকে দিয়ে দেন। মেরীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

সাদা ঘোড়াটি রেখে দিয়েছিলেন নবী নিজে। এটির নাম দিয়েছিলেন দুলদুল। নবীজীর অতি প্রিয় ছিল এই ঘোড়াটি। হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন এই ঘোড়াটিকে ব্যবহার করতেন।

নবীজীর প্রত্যেকটি ভাল জীবনী গ্রন্থে চিঠি পাঠানোর ঘটনা আছে। তবে বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। এখানে আমরা মূলত কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্ব-নবী'-তে (পৃ-২০৩-২০৯) উল্লেখিত বর্ণনা অনুসরণ করেছি। ইদানীং ইন্টারনেটে (You-Tube) নবীজীর পাঠানো মূল চিঠির ছবি দেখানো হচ্ছে। আপনারা দেখে নিতে পারেন।

মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধনীতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নিয়েই আমরা নবীজীর যুদ্ধ-নীতিকে সৃষ্টিছাড়া বলছি। আমাদের সীমিত জ্ঞানে মহাভারতের যুদ্ধনীতি ছিল এরূপ —

(১) সন্ধ্যা বেলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোন রকম বৈরিতা থাকবে না, সকলের মধ্যে প্রেম ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি বাগ্ যুদ্ধে রত রয়েছে, তার সাথে শুধু বাগ্যুদ্ধই করতে হবে।

(৩) রথীর সঙ্গে রথী, হাতী সওয়ারের সাথে হাতী সওয়ার, ঘোড়সওয়ারের সাথে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকরাই যুদ্ধকরবে।

(৪) যার যেমন যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ এবং বল তার সাথে সেই রকম প্রতিপক্ষই যুদ্ধ করবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে আগে থেকে সাবধান করবে।

কোন কোন ব্যক্তি অবধ্য সে ব্যাপারে নিময় হল —

(১) যে সৈন্যবাহিনী থেকে বাইরে গিয়েছে,

(২) যে ব্যক্তি অসাবধান বা অপ্রস্তুত রয়েছে,

(৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে,

(৪) যে সৈনিক একজনের সাথে যুদ্ধে রত রয়েছে,

(৫) যে বশ্যতা স্বীকার করেছে,

(৬) যে পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছে, এবং

(৭) যার অস্ত্র ভেঙ্গে গিয়েছে বা কবচ কেটে গিয়েছে তারা সকলেই অবধ্য।

এছাড়া রথের সারথী, অস্ত্রবাহক এবং ভেরী ও শঙ্খ বাহকরাও অবধ্য। যুদ্ধ শুধুই সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুই রাজার সৈন্যদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হত তখন অসামরিক সাধারণ প্রজারা যুদ্ধ দেখতে চর্তুদিকে জড়ো হতো।

এই সব নীতির সঙ্গে নবীজীর যুদ্ধনীতির কি কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে? সহজ উত্তর, না, কোনো মিল নেই।

স্বামীজী মহারাজ, বিন কাশিম থেকে শুরু করে আহমদ শাহ্ আবদালি পর্যন্ত বহিরাগত বর্বর মুসলমানরা নবীজীর যুদ্ধ-নীতিকে ভিত্তি করেই ভারত দখল এবং পরে শাসন করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের অসম সাহসী লেখিকা নূসরাত জাহান আয়েসা সিদ্দিকা নবীজীর অনুগামীদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে লিখেছেন —

" কিন্তু মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণ করল তখন তারা কোন নিয়ম নীতির ধার ধারলো না। লক্ষ লক্ষ পরাজিত হিন্দু সৈন্যকে কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ অসামরিক নিরীহ প্রজাকে হত্যা করে মৃত মানুষের পাহাড় তৈরী করল। এইসব ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার যে, অত্যন্ত সুসভ্য হিন্দু সংস্কৃতির লালিত পালিত হবার ফলে এদেশের রাজাদের পক্ষে মুসলমানদের চরিত্রই বুঝে উঠা সম্ভব হয়নি। এদেশের রাজারা যুদ্ধের মধ্যেও শিষ্টাচারের কথা ভাবতেন। রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগের দিন রাতে কৌরব শিবিরে গিয়ে সকল গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে এসেছিলেন। তখন কেউ তাকে বাধা দেয়নি বা বৈরিতা করেনি। ভারতীয় রাজারা বুঝতে পারেননি যে, মুসলমানরা এই সব শিষ্টাচারের ধার ধারে না। মুসলমানের যুদ্ধ কোন সামরিক যুদ্ধ নয়, কোরানের কাফের নিধনের তত্ত্ব দ্বারা চালিত হানা যুদ্ধ।" (লেখিকার 'ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার', ২০০৭, পৃ-৮৩)

মহারাজ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বাবা লোকনাথ কিংবা রামকৃষ্ণদেবের পক্ষে এ সব ইতিহাস হয়ত জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অভেদানন্দজী তো জানতেন। তাহলে কেন তিনি মনগড়া ভাষণ দিলেন?

অভেদানন্দজী লিখেছেন/বলেছেন, "মহম্মদ তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি (৬২২-৬৩২) মদিনাতেই অতিবাহিত করেন এবং সেই সময়ে তাঁর আরও অনেক দিব্য অনুভূতি হয়েছিল।" তিনি তাঁর বক্তৃতায় ঐতিহাসিক গীবনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নবীজী মদিনা গিয়ে কি ধরনের 'দিব্য অনুভূতি' লাভ করেছিলেন তা আমরা ঐ গীবন সাহেবের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর *'Decline and Fall of the Roman Empire.' [vol. v, p-356]* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, 'নবী মোহাম্মদ মদিনায় গিয়ে আরও তীব্র ও নির্মম ভাষায় জানালেন, তিনি এমন নতুন ঐশীবাণী পেয়েছেন যাতে বোঝা যায় যে, এর আগে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চলার যে পথ (means of persuation) তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তার ভিত্তিভূমি ছিল দুর্বলতা। (এখন) ধৈর্য ধারণের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এবার তিনি তরবারি দ্বারা ধর্ম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন; তিনি আদিষ্ট হয়েছেন পৌত্তলিকতার নিদর্শন সমূহ ধ্বংস করার জন্য। পৃথিবীর তাবৎ জাতি সমূহকে পথে *(অর্থাৎ 'ইসলামের পদতলে')* আনার ব্যাপারে দিন বা মাসের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার প্রশ্ন নেই।' [Qouted by Dr. Ambedkar in his Writings. & Speeches,vol. 12, p-33]

মদিনায় নবীজীর 'দিব্য অনুভূতির' পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে কয়েক হাজার পাতার বই লিখতে হয়। এখানে আমরা আর একটি মাত্র উদাহরণ দেব। নবী মোহাম্মদ ৬২৭ খ্রী. মদিনায় যে সব অমানবিক এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মদিনার কুরাইজা গোষ্ঠীর (ইহুদি) লোকেরা খন্দকের যুদ্ধে নবীকে সাহায্য না করে সাহায্য করেছিল নবীর শত্রু কোরেশ বাহিনীকে। এই অপরাধের জন্য নবীর ইংগিতে তারই প্রতিনিধি সা'দ ইবনে মুয়াধ *[Sa'd ibn Mo'adh]* কুরাইজাদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই, 'সব পুরুষদের হত্যা করা হবে; নারী ও শিশুদের বিক্রি করা হবে এবং কুরাইজাদের অস্থাবর সম্পদ (ইসলামী নাম 'গণিমতের মাল') মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মুয়াধের এই 'রায়' কে মহানবী মহান খোদার রায় বলে ঘোষণা করে বললেন — *'Truly the judgment of Sa'd is the judgment of God pronounced on high from beyond the seventh heaven,'* অর্থাৎ মু'য়াদের এই 'রায়' খোদারই 'রায়' যা তিনি সপ্তম বেহেশ্‌তের উপর থেকে উচ্চারণ করেছেন। যেদিন এই রায় দেওয়া হয়, সেদিন রাতে মদিনা বাজারের কাছে ৮০০ লোককে কবর দেবার মত গর্ত খোঁড়া হল এবং রাত শেষ হলে ভোরের নামায পড়ার পরপরই ওদের কোতল করার কাজ শুরু হয়। ঘাতকের ভূমিকায় ছিল আলি এবং তাঁর এক চাচাত ভাই যুবায়ের। প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত সাধারণ মানুষের সামনে এই কোতল পর্ব চলে। সমস্ত দিন ধরে নবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে প্রবল **মানসিক শক্তির (নাকি দিব্য অনুভূতির?) পরিচয়** রেখেছেন। ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে ছিল জমি-জমা, অস্থাবর দ্রব্যাদি, পশু এবং শিশু বাদে এক হাজার ক্রীতদাসী। মহানবী এর প্রত্যেকটির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে কয়েকজন মহিলাকে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উপঢৌকন দিলেন। অপর মহিলা ও শিশুদের বিক্রির জন্য 'নেজদ'-এ

পাঠিয়ে দিলেন।' (উইলিয়াম ম্যুরের 'লাইফ অব মাহমেট', ১৯৯২-এ ভারতে প্রকাশিত, পৃ-৩১৬-৩২২)

এই ঘটনার উল্লেখ করে একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পূর্বোক্ত লেখিকা নূসরাত জাহান আয়েসা সিদ্দিকা। তিনি লিখেছেন, "৬২৭ খৃষ্টাব্দে মদিনার বাজারে ৮০০ জন মাত্র ইহুদির *(কুরাইজা গোষ্ঠীর)* প্রাণ গিয়েছিল। ঐ সংখ্যাটা সামান্য। কেউ যদি তাদের ঐ অপরাধের দিকে তাকিয়ে সামান্য সংখ্যাকে উপেক্ষা করতে চান, তাতে দোষ নেই; কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন, ঐ ঘটনা ৬২৭ খৃষ্টাব্দে মদিনা বাজারেই শেষ হয়ে যায়নি। ইসলামের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরেই তার অনুরণন চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে না এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না; বরং কোরান হাদিস যত দিন থাকবে ততদিন এ কু-আদর্শ ফলে ফুলে পুষ্পিত হবে, তা যে কোন ব্যক্তিই জোর দিয়ে বলতে পারেন।" (লেখিকার 'ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার, ২০০৭, পৃ-৮৭)

এই মুহূর্তে ভারতের ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং মায়াপুরের ইস্কনকে আমরা সবচেয়ে বড় সংগঠন বলে মনে করি। আপনাদের অর্থাৎ রামকৃষ্ণপন্থীদের সবচেয়ে বড় কাজ সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন করা। মনে হচ্ছে সার্বিকভাবে ভারতকে রক্ষা করা এবং হিন্দুদের মোক্ষলাভের একমাত্র চাবিকাঠি সর্বধর্ম সমন্বয় করা। পক্ষান্তরে ইস্কনের গৌরাঙ্গপন্থীরা ভারতকে রক্ষা করার যাদুকাঠি হিসেবে মহাপ্রভু বর্ণিত প্রেম বিতরণের কাজ করে যাচ্ছেন। ইহজগতে মানুষের ৫-টি মৌলিক প্রয়োজনের (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) কথা তাঁদের মুখে শোনা যাচ্ছে না। দেশ-রক্ষার কথা ভুলেও তাঁরা মুখে আনেন না। ভারতের দরিদ্রতম হিন্দুটি থেকে শুরু করে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধান সকলে যদি অহোরাত্র খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করেন কিংবা সাদা কাপড়ে তৈরী থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জপের মালা টিপতে টিপতে মহাপ্রভুর নাম করেন তাহলেই বোধহয় বিদেশী শত্রুরা ভারত আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। এদিকে আপনারা অভেদানন্দপন্থীরা অথবা রামকৃষ্ণপন্থীরা চান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো আমরা যদি অহোরাত্র 'মা মা' বলি এবং তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মা-কালী, খোদা এবং যীশুর সঙ্গে দেখা করার গল্প প্রচার করি তাহলেই ইহ ও পরকালের কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যাবে।

গত ২০১১-এর ২৫ মার্চ সকাল ১১-টার সময় ফোন করে আপনাদের হেড অফিসের একজন কর্মকর্তার (সম্ভবত সাধারণ সম্পাদক) সঙ্গে কথা বললাম। আমরা জানতে চাইলাম, বেলুড় মঠ ও মিশনের মতো আপনারাও কি সর্বধর্মসমন্বয় সাধন এবং হিন্দুদের স্বর্গের পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণলোক' তত্ত্বে বিশ্বাসী? উত্তরে উনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে আপনারা আলাদা হয়ে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর উনি দিতে পারেননি।

এই মুহূর্তে সর্বধর্মসমন্বয় বলতে মূলতঃ হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধনকে

বুঝায়। কিন্তু একাজ কি আদৌ সম্ভব? ইসলাম ধর্ম কেবলমাত্র ইহুদি এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে আংশিক স্বীকৃতি দেয়, হিন্দু ধর্মকে আদৌ স্বীকার করে না। সে ক্ষেত্রে কিভাবে তাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন হতে পারে? এই জন্যই কি আপনারা নিজেদের রামকৃষ্ণপন্থী বলে পরিচয় দিচ্ছেন? এর ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। মুসলমানের কাছে আপনারা হিন্দু পৌত্তলিক; কোরানের বিচারে চিরদিনের জন্য অপবিত্র। আপনারা যে হিন্দু সে কথা তো মহামান্য সুপ্রিম কোর্টই তাদের ২.৭.১৯৯৫ তারিখের রায়ে বলে দিয়েছেন।[৭]

সুতরাং কোরানের বিচারে হিন্দু হিসেবে আপনারা চিরদিনের জন্য অপবিত্র। অভেদানন্দজী এ কথা জানতেন না, তা বিশ্বাস করতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এ সব জেনে শুনেও তিনি অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিকভাবে নবী মহম্মদকে 'মহাত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে কেউ যদি উপকৃত হয় তাহলে উপকৃত হবে মুসলমানরা, যারা নবীজীকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আদর্শ মানুষ বলে প্রচার করতে করতে ব্যালট বা বুলেটের মাধ্যমে হিন্দু প্রধান ভারতকে মুসলিম ভারতে পরিণত করতে চায়। স্বামী বিবেকানন্দ নবীজীর জাত-পাত বিবর্জিত সাম্যবাদী চিন্তাধারাকে সমর্থন করেও মহম্মদের ধর্মমতকে 'রক্তের বন্যা বইয়ের দেবার ধর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন। আপনারা এমন একটি নিষ্ঠুর সামরিক মতবাদকে ধর্মের মর্য্যাদা দিলেন যে মতবাদে গণতন্ত্রের স্থান নেই, পরমত বা পরধর্মসহিষ্ণুতার ছিঁটেফোঁটাও নেই। আর সেই মতবাদের প্রবর্তককে আপনারা বলছেন 'মহাত্মা'। এ কালের মুসলিম কবি নজরুল ইসলাম অমুসলমান কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবীরকে বিশ্বের সম্পদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই মহাপুরুষদের এবং তার সঙ্গে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা মহাত্মা বলে শ্রদ্ধা করি।

আসুন, মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী অভেদানন্দ কথিত 'মহাত্মা' হযরত মহম্মদের দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি তথ্য দিই।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূর্তি পূজারী ব্রাহ্মণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ। নবী মহম্মদ ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন পৌত্তলিক; তারপর নিজের আবিষ্কৃত ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান। আমৃত্যু তিনি মুসলমানই ছিলেন।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মে গভীর বিশ্বাসী এবং আস্থাবান থেকে আজীবন মূর্তি পূজা করে গেছেন। তিনি অন্য কোনো ধর্মেরই নিন্দা করেননি। হযরত মহম্মদ কিন্তু মুসলমান হয়েই তাঁর পূর্ব পুরুষদের চরম ভাবে হেনস্থা করা শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি এ কাজ থেকে বিরত হননি। তিনি অন্য কোনো ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করেননি।

৩। ঠিক হোক আর ভুলই হোক শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ সহ তাঁর অনেক শিষ্যও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যরা বেদ, উপনিষদ এবং তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন রিক্ত হস্তে। পক্ষান্তরে নবীজী নিজে মক্কা ও মদিনার বাইরে কোথাও যাননি। জীবনের শেষ ১০ বছর নারী এবং অস্ত্র ছিল তাঁর

একান্ত সঙ্গী। এই ১০ বছর তিনি ছিলেন যুদ্ধোন্মাদ। পররাজ্য জয় করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ লুঠ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিবেশি রাজ্য জয় করার জন্য প্রথমে তিনি দূতের মাধ্যমে চিঠি পাঠাতেন। চিঠিতে তিনি বলতেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন এবং নিরাপদ থাকুন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র জীবনে এক পলকের জন্যও এ ধরনের হীন চিন্তা করেননি।

৪। পরমহংসদেব ষড় রিপু দমন করে শুধু পরের স্ত্রীকে নয়, নিজের স্ত্রীকেও মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। নবীজী সেখানে এক ডজন বিয়ে করে রমণানন্দে বিভোর ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানকে বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছেন; এক থেকে ৪ জন পর্যন্ত। বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া ক্রয় করে আনা বা যুদ্ধে জয় করে আনা দাসীদের সঙ্গে যৌন সহবাসের অনুমতি দিয়েছেন। যুদ্ধ করে নিয়ে আসা কুমারী, বিধবা, সধবা নির্বিশেষে সকল মহিলাদের সঙ্গে তক্ষণ তক্ষণ যৌন সহবাসের অনুমতি দিয়েছেন। এ ছাড়া বিবাহিতা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিত্য নতুন স্ত্রীলাভের সুযোগ করে দিয়েছেন।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মাটির গড়া প্রতিমার মধ্যে মাতৃ-শক্তির জাগরণ দেখেছিলেন। নবীজী মাটির গড়া মূর্তির মধ্যে দেখেছিলেন শুধু পাপ আর পাপ। তাই মক্কা জয় করে কাবাঘরে রক্ষিত মূর্তি ভাঙার কাজ শুরু করেছিলেন নিজের হাতে।

৬। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেননি এক পলকের জন্যও। বলতে গেলে তাঁর অভিধানে 'যুদ্ধ' শব্দটিই ছিল না। নবীজী মানব সভ্যতা বিরোধী যুদ্ধনীতি 'জেহাদ', যার অপর নাম 'বিধর্মী সংহার নীতি' আবিষ্কার করে সমগ্র পৃথিবীকে রাবণের চিতায় রূপান্তরিত করে গেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই চিতার আগুন জ্বলতে থাকবে।

৭। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'যত মত তত পথ'। আর নবীজী বলতেন, একটাই মত এবং একটাই পথ। এর নাম ইসলাম। পৃথীতে আর কোন মত বা পথ নেই। আজকের পৃথিবীকে কম করেও শতকরা ৯০ জন মুসলমান এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথের মধ্যে 'ইসলামী মত' নেই বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

এবারে স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম এবং পয়গম্বর সম্পর্কে যা যা বলছেন তার কিছু অংশ স্মরণ করি —

১) "অনেক মুসলমানই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাদের মূল মন্ত্র ঃ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল। যা' কিছু এর বাইরে তা' কেবল খারাপই নয়, তা' সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে। যদি কোন পুরুষ বা নারী এই মতবাদে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসী হয়; তবে নিমেষেই তাকে হত্যা করতে হবে। যা' কিছু তাদের উপাসনা পদ্ধতির বাইরে তার সবকিছুই অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। যে সকল গ্রন্থে অন্য মত প্রচারিত হয়েছে সেগুলো পুড়িয়ে

ফেলতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শ' বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। এই হচ্ছে মহম্মদের মতবাদ।'' —'বিবেকানন্দের রচনা সংগ্রহ' (ইংরেজী), মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ, ১৯৭২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ- ১২৬।

২) আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম দ্বৈতবাদকে যেভাবে আশ্রয় করে আছে, অন্য কোন ধর্মে তেমনটি আর দেখা যায়নি। এমন অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যায়নি, যেখানে এই পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে এবং অপরের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে। কোরানের বিচারে যে ব্যক্তি এর শিক্ষায় অবিশ্বাসী সে নিধনযোগ্য। তাকে হত্যা করার অর্থ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন। এই কাফের নিধন হচ্ছে স্বর্গে পৌছিবার সুনিশ্চিত পথ। এই স্বর্গ অসামান্যা রূপসী হুরিতে পরিপূর্ণ এবং সেখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সর্ববিধ ব্যবস্থা রয়েছে।'' (উৎস ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ-৩৫২)

স্বামীজী মহারাজ, আপনি ইচ্ছে করলে এক্ষুণি আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন স্বামী বিবেকানন্দ কি নবী মহম্মদকে সাম্যবাদের জনক হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে নমস্কার জানাননি? হ্যাঁ, মহারাজ আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবেকানন্দ নবীজীকে সাম্যবাদের জনক বলেছেন এবং তাঁকে নমস্কার জানিয়েছেন। এটা হল হিন্দু বা ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব। বলতে পারেন শত্রুর মধ্যেও যদি কোন গুণ থাকে তবে তার স্বীকৃতি দেওয়া বা মহাপাপীর মধ্যেও যদি কোন পুণ্য থাকে তবে ঐ পুণ্যের জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়া। নবীজীর সাম্যবাদের চিন্তাধারাকে সম্মান জানালেও বিবেকানন্দ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করে গেছেন। তাঁর মতে আজ একজন হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলে একজন হিন্দুই শুধু কমল না, শত্রুর সংখ্যাও একজন বাড়ল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মেনিফেষ্টোতেতিনি মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন। অভেদান্দজী রচিত বেদান্ত মঠ ও মিশনের মেনিফেষ্টোতে তেমন কোন কথা নেই। আমরা অন্তত পাইনি। জানিনা অভেদানন্দজীর ২৫ বছর আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এছাড়া ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন এবং খ্রীষ্ট এবং শিখ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের পজিটিভ ও নেগেটিভ দিকগুলো তুলে ধরেছেন। শক্তিশালী ভারত গঠনের উদ্দেশ্যে বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় সাধন করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি এমন একজন মানুষের কল্পনা করেছিলেন যার মস্তিষ্কে থাকবে বেদ ও বেদান্ত এবং দেহটি হবে একজন মুসলমানের মতো শক্তিশালী। এটি কম্প্রোমাইজের কথা। এটি শুধু তাঁর কথা নয়, এটি ভারতীয় দর্শনেরও কথা। এসব কথা বলেও স্বামীজী নবীজীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আমাদের সকলকে এক একজন গুরুগোবিন্দ সিং হতে বলেছিলেন। দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংও (১৬৬৬-১৭০৮) অহিংসপন্থী ছিলেন। কিন্তু পিতা নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ এবং জোর করে ইসলাম

ধর্মে দীক্ষিত করার প্রতিরোধ কল্পে তিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক এবং পিতা-পিতামহের নীতির পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর সংস্কার কার্য ঐশী প্রেরণাপ্রসূত, শুধু ধর্ম প্রচারের জন্য নয়, অত্যাচারীকে ধ্বংস করার এবং পাপাচার বিনষ্ট করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। তাই বিনয় ও প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি ভগবান ও পবিত্র তরবারির উপর আস্থা স্থাপন করেন। তরবারিই ভগবান, ভগবানই তরবারি। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারত-কোষ', ৫/১৬৩)

অভেদানন্দজী কিন্তু বিবেকানন্দের পথে গেলেন না। তিনি সত্য-মিথ্যা এবং অর্ধসত্য মিলিয়ে একতরফাভাবে নবীর গুণকীর্তণ করলেন। সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করেছেন। আমরা বিশেষ ভাবে ৪ জন সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের সমালোচনা পড়েছি। এরা হলেন মোঘল সম্রাট আকবর, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারত-রত্ন ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে ইসলামের সমালোচনা করেছেন তার অনেকটাই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখব, সম্রাট আকবর কোন ভাষায় ইসলামের সমালোচনা করেছিলেন।

ইসলামের জন্ম থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত সম্রাট আকবরই সম্ভবত নবী এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক এবং ভারততত্ত্ববিদ ভিনসেন্ট এ. স্মিথের লেখা 'আকবর দি গ্রেট মোঘল' (২য় সংস্করণ) শীর্ষক ইতিহাস থেকে জানা যায় সম্রাট আকবর ইসলাম নবী, কোরান, হাদিস সব কিছু অস্বীকার করে দিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি মৃতদেহকে কবরস্থ করার সময় পূব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে পূব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘুমাতেন। সম্রাট সদ্য জন্ম নেওয়া ছেলেদের নামের সঙ্গে 'মহম্মদ' শব্দটি যুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। ইতিমধ্যেই যাদের নামের সঙ্গে 'মহম্মদ' শব্দ যুক্ত করা হয়েছে, তাদের নাম থেকে ঐ শব্দটি বাদ দেবার ফরমান জারি করেছিলেন। তিনি গো-হত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করেছিলেন।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁর রচিত সত্যার্থ প্রকাশের (১৮৮২) চতুর্দশ সমুল্লাস থেকে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১। কোরানের ২/১৬৫,১৬৮ এবং ১৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'শয়তানের অনুসরণ করিও না ....'। এই বক্তব্যের সমালোচনা করে মহর্ষি বলেছেন, 'শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে?' অর্থাৎ এ ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভূমিকা কি? (সত্যার্থ প্রকাশ, পৃ- ১০০২-০৩) ইসলামেরপশু হত্যা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন, "গবাদি উপকারী পশুর হত্যা নিষেধ না করায়, খুদা *(খোদা)* হত্যার প্রশ্রয় দিয়া জগতের অনিষ্টকর হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ কথা খুদার এবং তাঁহার পুস্তকের কখনও হইতে পারে না। (ঐ-১০০৪)

২। "এই কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, কোন ধার্মিক এবং বিদ্বান ব্যক্তিও ইহার রচয়িতা নহেন।

(পৃ- ১০০৯) '(নবীজী) 'স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরাণ রচনা করিয়াছেন কিংবা করাইয়াছেন।'' (ঐ-১০১৩)

৩। কুরাণ রচয়িতা ভূগোল এবং খগোল *(নভোমণ্ডল সম্পর্কিত)* বিদ্যা জানিতেন না। (পৃ-১০০৯)

৪। কোরাণের ৩/১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''ইসলাম ধর্ম নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।'' মহর্ষির প্রশ্ন — ইসলামের পূর্বে কি কোন ঈশ্বরীয় মত ছিল না? (ঐ-১০১২)

৫। কোরানের ২/৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ''যাহারা (কাফের সকল) আল্লাহ, তাঁহার ফিরেস্তাগণ, তাঁহার পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ সেই কাফেরদেরও শত্রু।'' মহর্ষি বলেছেন, ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারে না। (ঐ-পৃ-৯৯৬)

।। ইসলাম প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকর।।

ড. আম্বেদকর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই, তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের কট্টর সমালোচক। কিন্তু তিনি ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মও বাদ যায়নি তাঁর সমালোচনা থেকে। গতানুগতিক বৌদ্ধ ধর্মের খোল-নলচে পালটে দিয়েছেন তিনি। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন ইসলাম ধর্মের। কার্যত তিনি ইসলাম ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করতে চাননি। তিনি বলেছেন —

ক) বুদ্ধের শত্রু হিসেবেই ইসলামের জন্ম হয়েছে। এ কথা ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। কারণ, যাঁর কাছে বৌদ্ধ ধর্ম একটি উৎকৃষ্ট ধর্ম, তাঁর কাছে এই ধর্মের শত্রুও একটি ধর্ম, তা হতে পারে না।

খ) শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইসলাম গেছে, সেখানেই বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

গ) মুসলিম বিধান অনুসারে ভারত হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই গোষ্ঠীর সাধারণ মাতৃভূমি হতে পারে না।

ঘ) মুসলমানরা তাদের কাজের অনুপ্রেরণা লাভ করে কোরান-হাদিস থেকে এবং হিন্দুরা রামায়ন ও মহাভারত থেকে। তাই তাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই।

(মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত ড. আম্বেদকর রচনাবলীর (ইংরেজী) ৩য় এবং ৮ম খণ্ডেএ সব তথ্যের মূল বয়ান পাবেন।)

স্বামীজী মহারাজ, আজকের পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে মুসলিম জঙ্গীদের অমানবিক এবং ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম। গত ১০ বছরে পৃথিবীতে যত জঙ্গীপনা ঘটেছে তার কুশীলব সকলেই মুসলমান। যারা মক্কার সন্তান হযরত মহম্মদের আবিষ্কৃত ইসলাম ধর্ম মেনে চলে তারাই খাঁটি মুসলমান। ভারতে প্রায় প্রতিটি দাঙ্গার হোতা মুসলমান। গত ২০ বছরের মধ্যে আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির পার্লামেন্ট সহ বিভিন্ন মন্দিরে আক্রমণ করেছে মুসলিম জঙ্গীরা। অথচ জঙ্গী-অজঙ্গী নির্বিশেষে শতকরা ৯৯.৯৯৯ জন মুসলমান বলেন, ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি; ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। এই ধর্মের আবিষ্কারক নবী মহম্মদ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আদর্শ মানুষ; পরিপূর্ণ মানুষ। কলকাতা

থেকে প্রকাশিত মুসলিম সম্পাদিত সব কাগজে এবং তার সঙ্গে হিন্দুদের সম্পাদিত প্রায় সব কাগজে বছরের বিভিন্ন সময় এই শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

ভারতে আজ পর্যন্ত অগণিত হিন্দু সাধুর জন্ম হয়েছে। ভারতে বর্তমানে নাকি ২৫ লক্ষ ধর্মীয় সংগঠন আছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ লক্ষ এবং হাসপাতালের সংখ্যা মাত্র ৭৫ হাজার। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ৫.৫.২০১১, পৃ-৪)। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সাধুর সংখ্যা কত, সম্ভবত তার হিসেব নেই। আর বিধর্মীদের হাতে এ পর্যন্ত কত হিন্দুর প্রাণ গেছে তারও হিসেব নেই।

বাংলার ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে ভারত সেবাশ্রমের মতো ২/১-টি সংগঠন বাদে সব সংগঠন মন-প্রাণ দিয়ে 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের' কাজ করে যাচ্ছে। এদের কাজকর্ম দেখে এবং বক্তব্য শুনলে মনে হবে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার কাজে তো বটেই, মোক্ষলাভের জন্যও অনুরূপ সর্বধর্ম সমন্বয়' দরকার। এর সঙ্গে দরকার মুসলিম তোষণ এবং নবী মহম্মদকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ (ভাষান্তরে 'মহাত্মা') হিসেবে তুলে ধরা।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের আক্ষরিক অর্থ যা-ই হোক, বাস্তব অর্থ হচ্ছে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধন। আরও সহজ করে বলা যায়, হিন্দু মুসলমানের মিলন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলনের তত্ত্ব যথেষ্ট পুরনো। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলনের কর্ণধার ছিলেন শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা এবং জাতির পিতা বলে পরিচিত। তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু কাজের-কাজ কিছুই হয়নি।

স্বামীজী মহারাজ, আমাদের সাধারণ পড়াশোনায় দেখেছি, ১৯৪০ পর্যন্ত হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্রায় সকলেই ভাবতেন, মুসলমানরা নির্বোধ। ওদের মাথা মোটা। গরুখেকো মুসলমানদের বুদ্ধিও গরুর বুদ্ধির মতো জড়। তাই তারা পাকিস্তান দাবি করছে। পাকিস্তান-ফাকিস্তান কোনোদিন হবে না। ইসলাম সম্পর্কে 'বিশেষ অজ্ঞ' গান্ধীজী বলেছিলেন, 'পাকিস্তান ইজ এ পেটেন্ট আনট্রুথ।' এই গান্ধীজীই মুসলিম লিগের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ১৯৪৭-এ। পাকিস্তান হয়ে গেল 'পেটেন্ট ট্রুথ', যার ভয়ে ভারত আজও কাঁপছে। কেন কাঁপছে? কারণ, পাকিস্তানের হাতে আছে হিংসার উপর ভিত্তি করে রচিত কোরান, 'মহাত্মা' পয়গম্বরের যুদ্ধনীতি এবং একালের পরমাণু বোমা। 'মহাত্মা' মহম্মদের 'আসলী' বান্দারা পাকিস্তানের ক্ষমতায় এলে যে কোন সময় ভারতে পরমাণু বোমা মারতে পারে, এ আশঙ্কা করছে ভারত সহ সমগ্র অমুসলিম দুনিয়া।

১৯৭১ পর্যন্ত আমরাও ভাবতাম, মুসলমানদের মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমন কিছু নেই। কিন্তু কোরান-হাদিস এবং ইতিহাস পড়ে দেখলাম মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর মাথায় কিছুই নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী প্রণবানন্দের মতো হাতে গোনা কয়েকজন বাদ দিয়ে আমাদের সাধু-সন্তরা এদের মধ্যমণি। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মুসলমান মোল্লা-মৌলভী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি এবং বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই। পাকিস্তানে তো

কোরানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মুসলমানে মুসলমানে কাটাকাটি হচ্ছে। বোমাবাজি হচ্ছে। কিন্তু হিন্দুদের মুসলমান বানাতে হবে এবং ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে এতটুকু বিভেদ নেই। এ ব্যাপারে হিন্দু সাধু-সন্তদের চিন্তাধারা কিছুটা আলাদা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করছেন, কিন্তু মুসলিম তোষণ এবং নবী মহম্মদ সম্পর্কে অসত্য বিবৃতি দিতে কেউ এক কদম পিছিয়ে যেতে রাজী নয়। সেই যে কোন এক অশুভ মুহূর্তে 'শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ' একটি অদ্ভুতুড়ে গল্প লিখে বললেন, রামকৃষ্ণজী ইসলাম মতে ৩-দিন সাধনা করে এক 'সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের' (আল্লাহ্‌র) দিব্যদর্শন লাভ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজীর 'তিন দিন ধরে আল্লামন্ত্র জপ' করার গল্পটিই তো অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। কোন পৌত্তলিক তো দূরের কথা, নবীজী বাদে (!!) কোন সাচ্চা মুসলমানও আজ পর্যন্ত আল্লাহ নামের কোন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দর্শন পাননি। তামাম দুনিয়ায় আপনি একজন মুসলমানও খুঁজে পাবেন না, যিনি বিশ্বাস করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণজী তিনদিন নামাজ পড়ে কোন জ্যোতির্ময় পুরুষের দেখা পেয়েছিলেন।

৩০.৫.২০১১ তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় (২৭/১, বিধান সরণি, কলকাতা-৬) বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ পড়া' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক বলছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নামাজ পড়তেন — বিষয়টি আমার জানা ছিল। তবে এ নিয়ে মুখ খুলতে চাইনি। বয়স আশি পেরিয়েছে। কবে কখন হঠাৎ টেঁসে যাব। তাই এবার মনে হল, মুখ খোলা উচিত। .... শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বসানো ('ওই সময়ে আল্লামন্ত্র জপ' ইত্যাদি) কথাগুলি একেবারে বানানো। কারণ অনেক। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি অমুসলিমদের কাছে অতি জটিল। নামাজ পড়া আরও জটিল। .... অমুসলিমদের পক্ষে এ সব রপ্ত করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং তাকে এ সব শিখতে হলে মসজিদে অন্যান্যদের পাশে দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রত্যহ পাঁচবার ('ত্রিসন্ধ্যা' নয়) দাঁড়ানো এবং পূর্বকথিত পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

এই সব কারণে 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে এক মসজিদে শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ পড়তে যেতেন' এই বাক্যটিও বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না। এর প্রামাণিক তথ্যভিত্তি নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীম এ বিষয়ে উদ্ধৃত করেছেন, 'গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলাম', শ্রীম-এর এই বাক্যটিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার বলছি, ইসলামে আল্লামন্ত্র বলে কিছু নেই। দীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে অমুসলিম কে 'কলিমা শাহাদাত্' (শ্রেষ্ঠ আস্থাবাক্য) শেখানো হয়; 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই। মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ)।' এই বাক্যটি মুখস্ত করা সময়সাপেক্ষ।"

নামাজ পড়া সক্রান্ত ঐ গল্পে আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মন্ত্র জপকালীন সময় রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি পূজার প্রতি প্রবল ঘৃণা জন্মেছিল। হিন্দু দেব-দেবীকে প্রণাম কর তো দূরের কথা, তাঁদের দর্শন করতেও প্রবৃত্ত হত না। চিরজীবন নিরামিষভোজী হওয়া সত্ত্বেও

গো-মাংস খাওয়ার জন্য তাঁর প্রবল ইচ্ছা জন্মেছিল। মথুরামোহন বিশ্বাস নামে এক ভক্তের প্রচেষ্টায় তাঁকে সে কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

অক্ষয় কুমার সেন নামে এক ভক্ত কয়েক ধাপ এগিয়ে রামকৃষ্ণদেবকে সূক্ষ্মদেহে কুকুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে মরা গরু আস্বাদনের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে ছেড়েছেন। তিনি লিখেছেন —

অদ্ভুত সাধনা নাহি আসে বুদ্ধি বলে।	একদিন প্রভুদেব পঞ্চ বটমূলে।।
গঙ্গার জোয়ার দেখিছেন বসে বসে।	পচা মরা গরু এক ভেসে ভেসে আসে।।
সন্নিকটে কূলে লাগে তরঙ্গ আঘাতে।	আইল কুক্কুর এক লাগিল খাইতে।।
বুঝিনা কি ভাবে মগ্ন হইলা নারায়ণ।	কুক্কুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন।।
আরোপ করিলা নিজে তাহারও শরীরে।	যতক্ষণ আস্বাদন বাসনা না পুরে।।

(অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি', ১৯৯৭, পৃ- ১২১)

আল্লাহ্ মন্ত্র জপকালীন সময়ে এক মুসলমান পাচক আনিয়ে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা ***'মুসলিম প্রাণালীতে'*** রান্না করে ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে খাওয়াতে হয়েছিল। এখানে গল্পলেখকদ্বয় তাঁদের অজান্তে দু'টি মারাত্মক তথ্য দিলেন আমাদের। এক, আল্লাহ্ মন্ত্র জপ করলে রামকৃষ্ণের মতো কালীভক্ত ব্রাহ্মণেরও মূর্তি পূজার প্রতি প্রবল ঘৃণা জন্মে। দুই, আল্লাহ্ মন্ত্র জপ করলে যে কোনো ব্যক্তি গো-মাংস না খেয়ে পারে না, এমনকি অবস্থাভেদে মরা গরুও খাওয়ার ইচ্ছা জন্মে। এখানে একটি প্রশ্ন করব। মাত্র তিন দিন আল্লাহ্ মন্ত্র জপ করে যদি রামকৃষ্ণদেবের মতো পরম সংযমী মানুষেরও গো-মাংস খাবার ইচ্ছা জন্মে এবং মাতৃপ্রতিমা দর্শনে চরম অনীহা জন্মে, তবে বছরের পর বছর যারা মূল আরবী ভাষায় সঠিকভাবে আল্লাহ্ মন্ত্র জপ করে এবং বছরের পর বছর ধরে গো-মাংস খায় তাহলে মূর্তি-পূজা এবং মূর্তি-পূজারীদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব কোন স্তরে নেমে যেতে পারে?

'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭ম সংখ্যাটিতে (শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮) সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দ যথেষ্ট উৎফুল্ল চিত্তে রামকৃষ্ণদেবের আল্লাহ্ মন্ত্র জপ করা এবং গো-মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গটি অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন।

অভেদানন্দজী আমেরিকা যাওয়ার আগে কোরান-হাদিস না পড়লেও এই ঘটনাটি তো জানতেন। সেক্ষেত্রে আমেরিকা গিয়ে নবীজী সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রথম বাক্যেই কি করে বললেন, "পরমমানব পুত্র যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ছয় শতাব্দী পরে আরবের মহান ধর্মগুরু ইসলামধর্মের প্রবর্তকের সাহায্যে এই বিশ্বে পুনরায় পরমেশ্বরের ঐশী-শক্তির বিকাশ ঘটেছিল।" নবীজীর কাজ-কর্ম কি পরমেশ্বরের ঐশী-শক্তির বিকাশ?

আমাদের দর্শন অনুসারে পরমেশ্বর মঙ্গলময়। এই মঙ্গলময় পরমেশ্বর কি ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শনকে বিলুপ্ত করার জন্য নবীজীকে আরবে পাঠিয়েছিলেন?

আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন, শক্তিশালী ভারত গঠনের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ মুসলমানদের

কাছে যে প্রস্তাব (ইসলামী দেহ এবং হিন্দুর মস্তিষ্ক) রেখেছিলেন, ক'জন মুসলমান সে প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন? সম্ভবত একজনও নয়। এ খবর আপনাদের না জানার কথা নয়। তবুও কেন আপনারা অভেদানন্দজীর পরলোক গমনের ৭০ বছর পরে তাঁর ঐ বিতর্কিত বক্তৃতা প্রচার করছেন। কী আপনাদের উদ্দেশ্য, স্বামীজী?

১৯৪৬-এর আগষ্ট মাস থেকে শুরু করে আলোচ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের আগেরদিন পর্যন্ত ভারতে এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশে খোদার বান্দাদের কু-কর্মের কোন খবর রাখছেন না? ঐ সব বান্দারা যে নবীজীর নাম নিতে নিতে এবং কোরানের বিধান আওড়াতে আওড়াতেই পাশবিক কাজ-কর্ম করে যাচ্ছে, তা কি বিশ্বাস করেন না? ১৯৭১-এ এবং ২০০১-এ বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে হিন্দুদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছে খোদার বান্দারা, তা কি আপনারা জানেন না?

বর্তমান পৃথিবীর শতকরা ৯৮ জন মুসলমান তারস্বরে চীৎকার করে বলছেন, কোরান পবিত্র, হাদিস পবিত্র এবং নবীজীও পবিত্র। কিছু সংখ্যক মোল্লাই সব নষ্টের গোড়া। এই চরম 'মিথ্যাটি' সম্ভবত আপনাদের কাছে আরও পবিত্র। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ক'টি ঘটনা দেখাতে পারবেন, যেখানে আপনাদের মতো সাধুরা কোরান-হাদিস আর নবীজীর জীবনী নিয়ে ঐ সব মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন?

চিঠি শেষ করার আগে আর একটি কথা বলব। বর্তমানে কলকাতায় আমরা যে মনুসংহিতা দেখি, তা রচনা বা সম্পাদনা করেছেন পণ্ডিত সুমতি ভার্গব খ্রী. পূর্ব ১৮৫ অব্দে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমাদের পূর্বপুরুষ ৪-টি বড় মাপের পাপ করে গেছেন —

ক) গুণ ও কর্ম-ভিত্তিক বর্ণ-ব্যবস্থার পরিবর্তে জন্ম-ভিত্তিক জাত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা,

খ) অস্পৃশ্যতার মতো পাপ সৃষ্টি করা,

গ) ইতিহাসের পরিবর্তে গণ্ডায় গণ্ডায় স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করা, এবং

ঘ) কোরান-হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস না পড়া।

এ ছাড়া বর্ণে-বর্ণে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি তো ছিলই এবং এখনও আছে। এর ফলে শক-হুন-পাঠান-মোঘলদের কাছে পদে পদে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁরা। আজও আমরা খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে চরম অজ্ঞ। হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও তাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ধারণা গুরুর চরণ বন্দনা করলেই মোক্ষলাভ হবে। আজও আমাদের দেশে বিরাট সংখ্যক হিন্দু ধর্মগুরু নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে করতে শিষ্যদের বিভ্রান্ত করছেন। মুসলিম তোষণ করছেন। কিন্তু বিপদে পড়লে পালাচ্ছেন। তাঁরা একদিকে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব এবং উদারতার কথা প্রচার করছেন, অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মুসলিম তোষণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? দুর্বল যদি সবলকে তোষণ করে তাহলে সবলের চাহিদা আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায়। কংগ্রেসের মুসলিম তোষণের তীব্র সমালোচনা করে ড. আম্বেদকর বলেছেন, "Appeasement sets no limit to the demands of aggressor."।

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি উইনস্টন চার্চিল বলেছেন, "There is no greater mistake to suppose that platitudes, smooth words, and timid policies offer a path to safety." তিনি আরও বলেছেন, "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."

ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়। সত্বর পত্রোত্তর একান্ত ভাবে কাম্য।

নমস্কার সহ —

ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল ও ভারতীয় মুক্ত সমাজের পক্ষে —

শ্রীদেবজ্যোতি রায়(ফোন- ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬), ৫৩, বলাকা, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা। পঃ বঃ- ৭৪৩ ৭০৬।

অন্যান্য স্বাক্ষরকারী—

অ্যাডভোকেট শ্রীব্রজেন রায়, বারাসাত জাজেস্ কোর্ট, কল-১২৪; ডা. হরিপদ সিকদার; কলকাতা-১৩১ (ফোন-৯৯০৩৩৫৯৭১৭); শ্রীস্বপন কুমার দাস, কল-৮৩ (ফোন-৯২৩১৪২৮১৯৪); শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কলকাতা (ফোন-২৫৪৪ ১৭৪৫); শ্রীসুজিত কুমার সিকদার, কল-১০৪ (ফোন-৯৪৩৩৫৪০৯০৭); শ্রীমানবেন্দ্র সমাদ্দার, কল-৬৩ (ফোন-৯৪৩২৪৯৪৪৬৩); প্রকাশ চন্দ্র দাস, কলকাতা-৭৫ (ফোন-৯৪৩৩৪৫৩১০৯) ; শ্রীজগদীশ চন্দ্র হালদার (ফোন- ৯০০৭৭৮১৫৬৬); শ্রীগোপাল কৃষ্ণ সাহা (ফোন- ৯৮৩১৯৮৩৭৫৬) ; শ্রীমতি সিঞ্চিতা রায়-মৈত্র, কল-৬৩; শ্রীকার্তিক ব্যানার্জী, কল-১৩১; শ্রীকমলা কান্ত বণিক, উত্তর ২৪ পরগনা (ফোন-০৯২৩৯৮৫৬৬৪); শ্রীচঞ্চল দেবনাথ, কলকাতা-১২৪; (ফোন-৯৮৩৬২৬৮১৪৩) ; শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ (ফোন- ৯৪৩৩০৪৭১৪৪); শ্রীমাণিক লাল রায়, কল-১২৪ (ফোন- ৯৮০৪৭৩৩৪৪৩)।

অন্যতম মহা পুণ্যের কাজ ঈদের নামাজের পরে মুসলিম দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র কাছে যে ভাষায় প্রার্থনা করা হয় —

"হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা—বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ..... হে আল্লাহ্! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।" (দেখুন 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ- ১৪০৭, পৃ-১৬০)

।। উদ্ধৃতির উৎস ।।

১) 'Al-Koran of Mohammad' in 1734 and 'The Quran' by Medows Rodwell in 1861.

২) 'The QUR'AN' by Edward Henry Palmer in 1880, 'The Quran' by Dr. Mirza Abul Fazl in 1910, 'The Holy Qur'an' by Maulana Muhammad Ali in 1917, 'The Meaning of Glorious Koran' by M.M.Pickthall and 'The Holy Qur'an: Translation and Commentary' by Abdulla Yusuf Ali in 1934.

৩) "It is reported on the authority of Abu' Huraira that he heard the Messenger of Allah say: I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and all that I have brought ...." (Hadish No. 31 of Sahih Muslim, Chapter IX, The Book of Faith, page-17.)

৪) 445. Narrated Abu Dhar : The Prophet (PBUH) said, " Gabriel said to me, 'Whoever amongst your followers die without having worshipped othres beside Allah, will enter Paradise (or will not enter the (Hell) (Fire). "The Prophet (PBUH) asked, " Even if he has committed illegal sexual intercourse or theft? He replied, "Even then." (Al-Bukhari, Vol – IV, page – 296)

৫) " It is permissible to have sexual intercourse with a captive woman after she is purified (of menses or delivery). In case she has a husband, her marriage is abrogated after she becomes captive." Vide. Chapter DLXVII of Sahih Muslim, Vol. II, p-743.

৬) 'Fight in the name of Allah and in the way of Allah ..... Invite them (i.e. the infidels) to accept Islam, demand from them the Jizya ..... If they refuge to pay the tax, seek Allah's help and fight them.' — ডাঃ আবদুল হামিদ সিদ্দিকির 'সহী মুসলিম'-এর ৪২৯ নং হাদিস।)

৭) In the result we dismiss these appeals, however by setting aside the holding of the learned single Judge in the Writ Petition that Ramakrishna religion being a religion distinct and separate from Hindu Religion was a minority in West Bengal based on religion, entitled to protection under Article 30 (1) of the constitution of India as upheld by the Division Bench of the High Court in its judgment deciding the appeals before it and also by setting aside the holding of the Division Bench of the High Court that

Ramakrishna Mission as a religious denomination was entitled to establish and maintain institutions of general education under Article 26 (a) of the Constitution of India as those established and maintained for a charitable purpose. Having regard to the nature of controversies decided in these appeals, we direct all parties to bear their own costs.

Sd/- KULDIP SINGH, N. VENKATACHALA & S. SAGHIR AHMAD
New Delhi,July 2, 1995.

৮) From : Akbar: The Great Mogul (1542-1605), By V.A.Smith, 2nd Edition.

(1) " .... he (Akbar) rejected Islam, Prophet, Koran, tradition and all. As early as the begenning of 1580, the Fathers, when on the way to the capital, were told that the use of the name of Muhammad in the public prayers had been prohibited; .... " (page- 214) ;

(2) "Akbar totally rejected the fundamental doctrines of Islam, excepting monotheism, invented a new religion .... " (page-216); Akbar formulated various rules for the followers of his new religion i.e., Din Ilahi. We qoute here only a few:

(a) 'People should be burried with their heads towards the east, and their feet towards the west. His Majesty even commenced to sleep in this position.' p-219;

(b) 'No child was to be given the name of Muhammad, and if he had already received it the name must be changed.' p-220:

(c) 'The slaughter of cows was forbidden, and made a capital offence, as in a purely Hindu state. p-220;

(d) 'Beards were to be saved.' p-220;

(e) 'Garlic and onions, as well as beef, were prohibited, ... ' p-220;

(f) 'The study of Arabic, of Muhamadan law, and of Koranic exegesis was discountenaced, the specially Arabic letters of the alphabet were banned - and so on.' pp-220-21

***

সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

০১। মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ (২০০৪), স্বামী অভেদানন্দ।
০২। যুগে যুগে যাদের আগমন (২০০৪), স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।
০৩। 'উদ্বোধন' পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৪১৫।
০৪। মহাযোগী লোকনাথ এবং সমকালীন ভারতবর্ষ (১৯৯০), প্রণবকুমার মিশ্র।
০৫। দয়াল ঠাকুর (১৪১৪), শ্রীরমাশংকর ত্রিবেদী অনূদিত, সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।
০৬। ইসলাম প্রসঙ্গে (১৩৯২), শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।
০৭। ইসলামের রূপরেখা (২য় সংস্করণ, ২০০০), রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
০৮। তরজমা-এ-কুরআন মজীদ - বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কোলকাতা - ১৩, তৃতীয় প্রকাশ -১৯৯০। মূল্য - ১২০ টাকা।
০৯। The Meaning of the Glorious Koran – M.M.Pickthal. Taj Company, 3151, Turkman Gate, Delhi – 110 006, 1991. Price Rs. 25.00
১০। The Meanings of the Illustrious Qur'an (1997) by Abdullah Yusuf Ali. Farid Book Depot Private Ltd., Jama Masjid, Delhi-6.
১১। Sahih Al-Bukhari, Vol. IV, by Dr. Muhammad Muhasin Khan, Islamic University, Medina Al-Munawara, Pub : KITAB BHAVAN, N.D. – 25th Revised Ed.
১২। Sahih Muslim, Vols. I-IV, Trstd. By Abdullah Siddiqi, Pub. Do.
১৩। Dr. Ambedkar's Writings. & Speeches, Vol. 3,8 and 12
১৪। অক্ষয় কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি', ১৯৯৭।
১৫। যুধিষ্ঠির জানার (মালীবুড়ো) 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য', ১৯৯৫।
১৬। ইলিয়ট এবং ডাউসনের 'দি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স ওন হিস্ট্রোরিয়ানস, ৮ খণ্ড, ২০০১-এ পুনর্মুদ্রিত।
১৭। এনসাইক্লোপিডিয়া উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট সংস্করণ।
১৮। শ্রীচিত্তরঞ্জন গৌতমের 'মহানামব্রত প্রসঙ্গ', ৪র্থ সংস্ককরণ, ১৪১১।
১৯। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি শিষ্য সংবাদ', ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬০।
২০। অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত 'বিবেকানন্দের রচনা সমগ্র', মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড,১৯৭২।
২১। উইলিয়াম ম্যুরের 'লাইফ অব মাহমেট', ১৯৯২।
২২। প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন, শ্রীসুধীর রঞ্জন দত্ত, বাংলা ১৩৯৫।

।।পরিশিষ্ট - ক ।।

উত্তর ২৪ পরগনার (প. ব.) দে-গঙ্গায়

পাশবিক অত্যাচার দেখে এসেছি

২০১০-এর 'পবিত্র' রমজান মাসের ২৬ থেকে ২৮ (৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত তিন দিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জিলা শহর বারাসাত থেকে ২০ কি. মি. পূর্বদিকে দে-গঙ্গা থানার অন্তর্গত দে-গঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, বিশ্বনাথপুর, চ্যাংদোনা, আমিনপুর, খেজুরিডাঙ্গা এবং বেলিয়াঘাটা বাজার সংলগ্ন ঢালি পাড়া সহ বিরাট এলাকায় হিন্দুদের উপর এক তরফা পাশবিক অত্যাচার ঘটে গেল। আক্রান্তদের শতকরা প্রায় ৭০ জন পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দু। দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় দে-গঙ্গা থানার অদূরে চট্টলপল্লীতে। এখানে গত ৪০ বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। বড় রাস্তা দিয়ে এই পুজো মন্দিরে যেতে হলে প্রায় ২.৭৫ একর পরিমিত একটি প্লট পেরোতে হয়। এই প্লটটির বাঁ-দিকের আধাআধি অংশে মুসলিমরা কবরখানা বানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য অনুসারে ওয়াক্‌ফ বোর্ড নাকি তাদের এই অনুমতি দিয়েছে। আসলে এই প্লটটি এক সময় রানি রাসমনির মালিকানাধীন ছিল। সরকার এটিকে অনেকদিন আগে খাস করে নিয়েছে। প্লটটির ডানদিকে ৬০ ফুট চওড়া একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীরা যাতায়াত করেন এবং দুর্গা পুজোর সময় হাজার হাজার মানুষ পুজো দেখতে আসেন।

চট্টলপল্লীবাসীদের দাবি অত্যন্ত সামান্য। তারা পূর্বোক্ত ৬০ ফুট চওড়া রাস্তাটি বহাল রাখতে চান এবং তাদের নিজস্ব প্লটে নির্বিবাদে পুজো করতে চান। কিন্তু ওখানকার বেশির ভাগ মুসলমান তা চান না। গত ১৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর আমরা বেলিয়াঘাটা থেকে দে-গঙ্গা বাজার পর্যন্ত আক্রান্ত এলাকাগুলো দেখতে যাই। চট্টলপল্লীতে গিয়ে জানতে পারি, স্থানীয় প্রায় সকল মুসলমানের ইচ্ছা বিতর্কিত প্লটটির চার দিকে দেওয়াল তুলে ঘিরে দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এর ফলে পুতুল পুজোর মতো ক্ষমাহীন পাপের কাজ বন্ধ করে দেওয়া যাবে এবং বাঙালি হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করা যাবে। গত ৬ সেপ্টেম্বর (২৬ রমযান) সকালের দিকে প্রায় ১ হাজার মুসলমান ওখানে এসে বিতর্কিত প্লটটির সীমারেখায় দেওয়াল তৈরির জন্য ভিত কাটা শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভিত কাটা হয়ে যায়। হিন্দুরা এই কাজে বাধা দিলে মুসলমানরা অশ্লীল ভাষায় গালাগাল শুরু করে এবং অমল কর নামে এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মারধোর করে। হঠাৎ বসিরহাটের সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেস) হাজী নুরুল ইসলাম তৃণমূল নেত্রী রত্না রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে এসে উপস্থিত হন। উভয়পক্ষ তাদের কাছে অভিযোগ জানালে হাজী সাহেব

মিটমাট করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে দে-গঙ্গা থানায় গিয়ে গোপন বৈঠক করে চলে যান ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত জামে মসজিদে। সেখানে ইমাম সাহেব এবং তার সহযোগিদের সঙ্গে কথা বলে মসজিদের ছাদে স্থায়ীভাবে মাইক বসিয়ে দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন গত নির্বাচনের আগে হাজী সাহেব কথা দিয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি বিতর্কিত জমিটি মুসলমানদের হাতে তুলে দেবেন এবং ঐ জামে মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক বসিয়ে দেবেন। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিতর্কিত জমিটি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে এবং আলোচ্য মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক না বসানোর নির্দেশ আছে কোর্টের।

বিরাট সংখ্যক মানুষের অভিযোগ, মসজিদ থেকে বেড়িয়ে হাজী সাহেব রত্নাদেবীকে নিয়ে আবার থানায় গিয়ে রাত ৯-টা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। বিকেলে ইফতার শেষ হতে না হতেই প্রায় ২ হাজার দাঙ্গাবাজ মুসলমান বোমা, পিস্তল, ভোজালি, পেট্রোল এবং অ্যাসিড বাল্‌ব নিয়ে দে-গঙ্গা বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় একযোগে বেছে বেছে কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। এখানে হিন্দুদের রাজনৈতিক রং কোনো কাজে আসেনি। সি-পি-এম সমর্থক কাপুরিয়াদের মিষ্টির দোকান যেমন আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি আক্রান্ত হয়েছে টি-এম-সি-র জাঁদরেল সমর্থক কানাইলাল গুপ্তার দোকান এবং নিরপেক্ষ গোপাল মণ্ডলের দোকান। আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অজস্রবার থানায় ফোন করা হয়েছিল; কিন্তু ফোন ধরেননি কেউ। অভিযোগ, হাজী সাহেবের নির্দেশেই পুলিশ ফোন ধরেনি।

আমরা দু'দিনে দীর্ঘ সময় ধরে শতাধিক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। ভিডিও করে এনেছি। তাদের বক্তব্য অনুসারে ৬ তারিখ দে-গঙ্গা বাজারে তাণ্ডব চালাবার পরে পাশ্ববর্তী বিপ্লবী কলোনী আক্রমণ করে। ওখানকার মন্দির ভাঙচুর করে। তারপর তারা চলে যায় কার্তিকপুর বাজারে। সেখানে অনেক ঘরবাড়ি ভাঙচুর করার সঙ্গে ওখানকার প্রধান মন্দির আক্রমণ করে। কালী প্রতিমা ভেঙে দেয়। তাতেও খুশি না হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে মন্দিরের মধ্যে প্রস্রাব করে দেয়। রাস্তায় ৪-টি বড় গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, ১০০/১৫০ হাত উঁচু কয়েকটি গাছও পুড়ে যায়। দুষ্কৃতিরা ৭ তারিখ আক্রমণ করে বেলিয়াঘাটা বাজার এবং তৎসংলগ্ন ঢালিপাড়া। সকালেই ঐ এলাকায় র‍্যাফ নামে। তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাঙ্গাবাজরা রাস্তার উপরে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের গাড়ি, লরি এবং বাস জ্বালিয়ে দেয়। এগুলোর কঙ্কাল রাখা ছিল দে-গঙ্গা থানার পাশে।

৮ তারিখ বুধবার কার্তিকপুর থেকে ১ কিলোমিটার দূরে খেজুরডাঙ্গায় ৬-টি হিন্দু বাড়ি সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিকদের নাম অভিলাষ ঘোষ, নেপাল ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বাদল ঘোষ, তাপস ঘোষ এবং হরেন্দ্রনাথ বক্সী। এই বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৮ তারিখ বুধবার। তখন বড় রাস্তা (টাকি রোড) দিয়ে 'র‍্যাফ' এবং 'সেনাবাহিনী' টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল, রমযান মাস বিধায়

কোন প্রকার লাঠি চার্জ বা গুলি চালানো যাবে না। সেদিন সকালবেলা স্থানীয় মকলুকুর রহমান আর সোহরাব কিছুটা দূরে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে গুজব রটিয়ে দেয় যে, কার্তিকপুরের বাঙাল হিন্দুরা মুসলমানদের মাথা কেটে ফুটবল খেলছে। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মুসলিম 'নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে খেজুরিডাঙ্গার হরেন বক্সীর বাড়ির সামনে এসে প্রথমে টহলরত পুলিশের একটি গাড়ি আক্রমণ করে। পুলিশদের গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে পেটাতে শুরু করে এবং গাড়িটিকে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে বক্সীবাড়ির ১০ জন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১ কি. মি. দৌড়ে মুসলমান পাড়ায় আশ্রয় চায়। সেখানে আশ্রয় না পেয়ে পার্শ্ববর্তী দাসপাড়ার এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ততক্ষণে বক্সীবাড়ি এবং ঘোষবাড়ির ৬-টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১ কি. মি. দূরত্বের মধ্যে এমন কোন হিন্দু বাড়ি ছিল না যেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এখানকার গ্রাম্য হাসপাতালটিও ভাঙচুর করা হয়েছে। গুণ্ডারা পরিকল্পিত ভাবে বক্সী বাড়ির কাছে একজন মুসলমানের (আহাদ আলি) একটি কুঁড়ে ঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৫ এবং ২৬ তারিখ আমরা বেলেঘাটা গিয়ে দেখলাম ওখানে বাচ্চু কর্মকারের বাড়ি এবং তার কাছাকাছি ঢালি পাড়ায় ১৪/১৫-টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫০-টির বেশি দোকান লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢালি পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়েছে। মারধোর করা হয়েছে। পাকা বাড়িগুলোর গেট ভাঙা হয়েছে বোম চার্জ করে। অনেকে বলেছেন, টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বাচ্চু কর্মকারের। তিনি ঐ এলাকার সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। প্রকাশ্য দিবালোকে লরি লরি লুটের মাল অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আমাদের পুলিশ বাহিনী তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছে।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন ৭ তারিখ ভোরে বেলেঘাটায় টহলরত র‍্যাফকে ঢিল ছুঁড়তে গেলে তাদের গুলিতে সাহাবুদ্দিন নামে একজন মুসলিম যুবক মারা যায়। কিন্তু দুর্বৃত্তরা রটিয়ে দেয় যে, বাচ্চু কর্মকার তার লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে ঐ যুবকটিকে গুলি করে মেরেছে। এই ভিত্তিহীন অপরাধের জন্য বাচ্চুবাবুর সোনার দোকান লুটপাট করা হয় এবং তার বাড়িটি সম্পূর্ণ ভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পড়ে আছে শুধু খাঁচাটি। বাচ্চুবাবু ভাগ্যজোরে ছেলে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। আমরা অতি কষ্টে ১৫ তারিখ তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, কোনদিন আমাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল না। আজও নেই। আমাদের দোকান এবং ঘরবাড়ি লুট করার জন্যই এই প্রচার। ২৬ তারিখ গিয়ে তাদের কোন খোঁজ পাইনি। আজও (১.১২.২০১০) তারা বাড়ি ফিরতে পারেননি। কারণ, তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে।

তারপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৭৫ বছর বয়স্ক বিশ্বনাথ ঘোষ। তার বাড়িতে ঢুকে দাঙ্গাবাজরা প্রথমেই তাকে ঘুষি মারে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার একটি দাঁত পড়ে যায়। অন্য

আর একজন বিশ্বনাথবাবুর ছেলে জগদীশকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। অন্যান্যরা মেয়েদের শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নিয়ে মারতে শুরু করে। পেট্রোল ঢেলে প্রতিটি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের ক্ষতির পরিমাণ কম করেও ৫ লক্ষ টাকা। কাছেই থাকেন অঞ্চল প্রধান সদস্য (তৃণমূল) তথা শিক্ষক তারাপদ ঘোষ। আমরা তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমতা আমতা করে হাজী নুরুল ইসলাম সাহেবকে সমর্থন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তবে তিনি স্বীকার করলেন ঐ ৩ দিনের ঘটনা হিন্দুদের উপর মুসলমানদের পরিকল্পিত অত্যাচার। আমরা প্রশ্ন রাখি, তৃণমূল সমর্থনকারী হিসেবে আপনি সি.পি.এম-কে দায়ী করবেন কী? উত্তরে তিনি বললেন, এই তিন দিন প্রশাসন প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল। এই নিরিখে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করছি। তৃণমূল সমর্থক ওখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতি কবিতা বৈদ্য টেলিফোনে জানান, দুষ্কৃতীরা তাদের বাড়ীর সকলের গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে হাত-পা ধরে কোনো রকমে ছাড়া পান।

২৬ তারিখ আমরা ঢালি পাড়ার ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় সব বাড়িতে গিয়েছি। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক সুকুমার মিত্র পরিবেশিত দু'টি খবর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়াই আমাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম খবরটিতে বলা হয়েছে, ঢালি পাড়ার হিন্দু মেয়ে-বউদের আশ্রয় দিয়েছে পার্শ্ববর্তী মুসলিম পাড়ার মুসলিম মহিলারা। খবরটি একেবারে অসত্য নয়। একটি জঘন্য ও নিষ্ঠুর পরিকল্পনার অংশ এটি। ঢালি পাড়ার বউ-বাচ্চাদের দূরে ডেকে নিয়ে ঘরগুলি খালি করে সহজে লুটপাট এবং পুড়িয়ে দেবার কাজ সহজ করার উদ্দেশ্যেই ঐ নাটক করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় মুসলমানরা যে মোটেই হিন্দুবিদ্বেষী নয়, তা প্রমাণ করা। বেলিয়াঘাটার মুসলমানরা যে ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করেছে, সে কথাও মিথ্যা নয়। এর পেছনে ছিল আরও গভীর চক্রান্ত। বেলেঘাটায় ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু মাত্র তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ক্ষতিগ্রস্থদের যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা যারা বুঝতে পেরেছেন, তারা ঐ অনুগ্রহের দান গ্রহণ করেননি। যেমন, বিশ্বনাথ ঘোষ। তবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ ঘোষ অনুগ্রহের দান ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐ এলাকায় কোন সরকারী সাহায্য যায়নি। খেজুরডাঙ্গায় যাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের রান্না করার মতো কোন বাসন-পত্র ছিল না। এই খবর পেয়ে কলকাতার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেলঘরিয়ার ভারতীয় মুক্ত সমাজ, বামনগাছির ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল এবং কলকাতার হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে থালা-বাসন, জামা-কাপড় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বই-পত্র কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর বুধবার জমিয়তে উলেমা-ই হিন্দের মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ্ সাহেব ৮/১০-টি লরিতে লোকজন নিয়ে 'শান্তি-মিছিল' করেছেন। তাদের প্রধান শ্লোগান ছিল, 'দে-গঙ্গার কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে'। তা ছাড়া 'বাচ্চু কর্মকারকে গ্রেফতার

করতে হবে', নিহত সাহাবুদ্দিনের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে', দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি চাই' প্রভৃতি শ্লোগানও দেওয়া হয়েছে। অতিথিদের মধ্যে সন্তোষ রাণা, রবীন্দ্র দেবনাথ, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস এবং সুকুমার বিশ্বাসের মতো দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তাদের উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন কিনা তা কেউ বলতে পারলেন না। কারণ, সবাই ছিলেন গাড়ির মধ্যে।

ঈদের পরপরই 'তেহেলকা' ম্যাগাজিনের একজন সাংবাদিকের কাছে হাজী নুরুল ইসলাম বলেছেন, 'আমার কাছে খবর আছে, সি-পি-এম-এর ইয়াকুব এবং নিতাই ছিল এই সব লুটতরাজের নায়ক।' এই বক্তব্যের বিন্দুমাত্র সত্যতা আমাদের অনুসন্ধানে ধরা পড়েনি।

সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা কোনো দলকেই সরাসরি দায়ী করছেন না। সি-পি-এম-কেও নয়। যে কেউ স্পটে গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করলে বুঝতে পারবেন, ঐ তিন দিনের দুর্ঘটনার পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে কোনো হিন্দু ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দারা কেবলমাত্র বেলিয়াঘাটা বাজারের ৬০ জন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের নামের একটি তালিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। খেজুরিডাঙ্গার অভিলাষ ঘোষ দে-গঙ্গা থানায় ৫৯ জন মুসলিম দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদের মধ্যে কেবলমাত্র মাত্র মকলুকুর এবং তালেবকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে জামিন পেয়ে তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিলাষবাবু তার লিখিত অভিযোগে বলেছেন, 'বাংলাদেশী মুসলমান খালেক মণ্ডলের স্ত্রী আর্জিনা বিবি একজন দুষ্কৃতীর নির্দেশে তাহার বাড়ি হইতে এক ড্রাম কেরোসিন তেল আনিয়া দেয় এবং এই তেল ঢালিয়া আমার বাড়ির ৪-টি ঘর জ্বালাইয়া দেয়।'

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই মুহূর্তে যারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার তারা কেউই দে-গঙ্গা গিয়ে আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াননি। তা ছাড়া যে সব মহাপুরুষেরা আগুন খেয়ে হজম করতে পারেন কিংবা 'ব্যাজ' পরিয়ে আমাদের বৈকুণ্ঠ লাভের গ্যারান্টি দেন তারাও কেউ ওখানকার হতভাগ্য হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি। এ ছাড়া প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া একেবারেই চুপ ছিল। আসুন, সবাই মিলে এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। (তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনা ঃ শ্রীদেবজ্যোতি রায়।)

—ঃ সর্বশেষ খবর ঃ—

বাচ্চু কর্মকারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছিল ৩০২ ধারা অনুসারে। কিন্তু পুলিশী তদন্তে তেমন কোনো প্রমাণ না মেলায় শ্রীকর্মকারের জামিন হয়েছে; কিন্তু মৌলবাদী হুমকির কারণে তিনি আজও (২০.১২.২০১১) নিজের বাড়ীতে ফিরতে পারেননি।

।।পরিশিষ্ট - খ।।

কোরান তথা নবীজীর তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের মতামত

কোরান-হাদিস এবং নবীজীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোনো উপায়ে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে মুসলমান বানানো। পৃথিবীর যে সব অমুসলিম দেশে গণতন্ত্র আছে সে সব দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বুলেট ব্যবহারের প্রস্তুতি।

হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান বাদে পৃথিবীর ১২৫ কোটি মুসলমানের প্রায় সকলেই বলে থাকেন ইসলাম শব্দের অর্থ 'শান্তি'। অথচ কোরানের ৩/১৯-২০ নং আয়াতে পরিচ্ছন্নভাবে বলা আছে ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ।

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ৫-টি মোক্ষম দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন নবীজী —

১। যে কোনো মুসলমানের একসঙ্গে ৪ জন বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে পারবে। এদেরকে একসঙ্গে বা একের পর এক তালাক দিয়ে সারা জীবন বিয়ে করে যেতে পারবে একজন মুসলমান। ভারত সহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই বিধান প্রযোজ্য।

২। অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্যকে ইসলামের অভিধান থেকে মুছে ফেলে ইসলাম গ্রহণ এবং অনুসরণের পথ অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন।

৪। নবী মহম্মদঘোষণা বলে গেছেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার আগের সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। (হাদিস সহি মুসলিম) এবং

৫। সকল মুসলমানকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে অঢেল অতি সুস্বাদু খাদ্য এবং পুরুষদের প্রত্যেককে অন্তত ৭২ জন চিরকুমারী হুরীদের সঙ্গে বিরতিহীন নিবিড় যৌন সঙ্গমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিধর্মী কোনো মেয়ে বা বউকে মুসলমান না বানিয়ে বিয়ে করা যাবে না এবং তার সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে না। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই নিয়মের ছাড় আছে। যুদ্ধে প্রাপ্ত বিধর্মী মেয়ে-বউকে হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে, যদি ঐ মহিলা রজঃস্বলা বা গর্ভবতী না থাকে। (হাদিস সহি মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৩)

ইহকালে লুটপাট , চুরি-ডাকাতি এবং নারী ধর্ষণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অঢেল সুযোগ এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন নবীজী। বলা হয়ে থাকে যে, এর সবই সর্বশক্তিমান তথা পরম দয়ালু মহান খোদার নির্দেশ।

নবী মহম্মদ পৃথিবীর দেশগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন যে সকল দেশের শাসনকর্তা মুসলমান সেসব দেশের নাম দার-উল-ইসলাম (শান্তির দেশ) এবং যে সব দেশের শাসনকর্তা অমুসলমান সেসব দেশের নাম দার-উল-হার্ব (শত্রুর বা যুদ্ধের দেশ)। শত্রুর দেশের সঙ্গে ইসলামের যুদ্ধ চলতেই থাকবে, যতদিন ঐ দেশ ইসলামের পদতলে না আসে।

নবীজী পৃথিবীর মানুষদেরও দু'ভাগে ভাগ করেছেন — বিশ্বাসী (মুসলমান) এবং অবিশ্বাসী (অমুসলমান)। এর নাম দ্বি-জাতি তত্ত্ব।

বাঙালি হিন্দু সাধু-সন্তদের মধ্যে ২/১ জন ছাড়া সকলেই এই মহানবী এবং ইসলামের মধ্যে আবিষ্কার করছেন শান্তির অপার করুণাধারা।

পরিশিষ্ট-গ
ভারতীয় জ্যোতিষীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রকাশের লগ্নে অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাদের কথা মনে পড়ে গেল। শত শত বছর ধরে আপনারা মনুষ্যদেহের রোগ-ব্যাধি নিরাময় সহ তাদের ভাগ্যোন্নতির বিধান দিয়ে আসছেন। আপনারা অনেকেই 'রাজজ্যোতিষী', 'জ্যোতিষ সম্রাট' -এর সম্মান অর্জন করেছেন। ছোট বেলা থেকে আমরা পঞ্জিকা এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখে আসছি আপনারা কেউ তিন মিনিটে, কেউ পাঁচ মিনিটে, কেউ বা ১ দিনের মধ্যে বশিকরণ করতে পারেন। শত্রু দমন করতে পারেন। ব্যর্থ প্রেম ফিরিয়ে আনতে পারেন।

এই মুহূর্তে সমগ্র ভারতে আপনাদের সংখ্যা ১ লক্ষের কাছাকাছি হলেও হতে পারে। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক বাঙালি জ্যোতিষী আছেন, যারা ঠিক আমাদের মতোই ধন-প্রাণ এবং মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে না পেরে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছেন এখানে। কারণ, দুনিয়ার সেরা চারজন মুসলিম 'ধর্মবেত্তার' মধ্যে তিনজনেই আমাদের জন্য ইসলাম অথবা মৃত্যুর বিধান দিয়েছেন। চতুর্থ ধর্মবেত্তা হানাফী সাহেব আমাদের জিজিয়া কর প্রদানের বিনিময় 'জিম্মি' (রক্ষিতা/রক্ষিতা) হিসেবে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার ফতোয়া দিয়ে গেছেন। তাই ওপার বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধরা গত ৬৭ বছরে অনেকে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং অনেকে জিম্মীর জীবন সহ্য করতে না পেরে এখানে চলে এসেছেন।

ভারত উপমহাদেশ তথা পৃথিবীর অন্তত ৯০ ভাগ মুসলমান বাংলাদেশ এবং ভারতে অনুরূপ অত্যাচার চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর যতদিন আমরা সবাই মুসলমান হয়ে না যাই। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দেবুল (গুজরাট) থেকে শুরু করে ২০১০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের অদূরে দেগঙ্গায় ঘটে যাওয়া (পরিশিষ্ট-ক) পৈশাচিক ঘটনা আমাদের অন্য কিছু ভাবতে দেয় না।

এই সমস্যাটি নিয়ে কিছু ভাবছেন কি আপনারা? একটু-আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের রাজনীতিবিদরা এবং সাধু-সন্তরা একযোগে 'নবীজীর গুণ কীর্তণ', 'মুসলিম তোষণ' এবং 'সর্বধর্ম সমন্বয়' নামক 'তাবিজ' পরে এই তীব্র সমস্যার সমাধান করতে চান। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র ঘেঁটে দেখুন তো আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে এই 'তাবিজ' কতটা কার্যকর হবে?

পরিশিষ্ট-ঘ

ইং- ৬.৯.২০০৭ তারিখে দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর।

ব্যাজ পড়লেই বৈকুণ্ঠলোকে, গ্যারান্টি দিচ্ছে ইসকন

বাপি ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর — স্বর্গ বা নরক আছে কিনা জানা নেই। বা থাকলে কোথায় আছে, তা ধর্মভীরুরাই বলতে পারবেন। তবে যাই হোক না কেন, আপাতত স্বর্গ আছে বলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে বিশেষ ব্যাজ বাজারে ছেড়েছে শিলিগুড়ি ইসকন। ১০১ টাকা থেকে শুরু করে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'ডোনেশন' দিয়ে যাঁরা মঙ্গলবার রাতে ইসকনের বিশেষ অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ওই ব্যাজ ধারণ করেছেন, তাঁদের বৈকুণ্ঠলোক মানে স্বর্গলোকে যাওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছে এখানকার ইসকন কর্তৃপক্ষ। আর বিভিন্ন অঙ্কের 'ডোনেশন' দিয়ে যাঁরা খুব সহজে স্বর্গে যেতে চান, তাঁদের স্বর্গলোকে পৌছনোর আগে ব্যাপকভাবে প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন ইসকনের সাধুরা।

ইসকনের এই স্বর্গযাত্রার ব্যাজ ধারণ থেকে অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিতদের তালিকায় অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উত্তরবঙ্গ শাখার আই জি গৌরব দত্ত। ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পুর কাউন্সিলর, কমিউনিস্ট পার্টির পুর কাউন্সিলর এবং আরও অনেক ভি আই পি। ভি আই পিদের তালিকায় চাল-ডালের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে লোহা ব্যবসায়ীসহ আরও অনেকেই ছিলেন। তবে সি পি এম, সি পি আইয়ের ছোটো নেতা-মাঝারি নেতাদের নাম গোপনই রাখতে চেয়েছিলেন ইসকনের স্থানীয় সাধুরা। এনিয়ে সাধুদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও শুরু হয়ে গিয়েছে। সব তথ্য তাঁরা বলতে নারাজ।

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের অন্যতম কর্মকর্তা ব্রজরাজ দাস বলেছেন, দশ হাজারের মতো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, মঙ্গলবার রাত বারোটায় অভিষেক অনুষ্ঠানে দুধ, দই, ঘি, মধু দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা তাঁদের মন্দিরে স্নান করিয়েছেন, তাঁরাই এই জড়জগতে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন। তাঁদের আর কোনওদিন মাতৃগর্ভে ঠাঁই হবে না। আবার অভিষেক-অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে যাঁরা এদিনের বিশেষ ব্যাজ ধারণ করেছেন, ইসকনের সাধুদের কাছ থেকে, তাঁরাও স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠলোকে ঠাঁই পাবেন মৃত্যুর পর। ব্যাজ বা অভিষেকের জন্য পাস তৈরি হয়েছে। ছিল কুপনও। ১০৮ টাকা থেকে ৫০০১ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে ওই কুপনের জন্য। এর বাইরে আছে আবার ডোনেশন।

মন্দিরের অন্যতম কর্মকর্তা ব্রজরাজ দাস বলেছেন, রাত আড়াইটে পর্যন্ত অভিষেক অনুষ্ঠান এবং প্রসাদ বিতরণ পর্ব চলে। মঙ্গলবার সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে শিলিগুড়ি ইসকন চত্বরে। এর মধ্যে যাঁরা অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ব্যাজ ধারণ করেছেন, তাঁরা সকলে বৈকুণ্ঠলোক বা স্বর্গে যাবেন বলে ব্রজরাজবাবুদের দাবি।

এরপর সাতের পাতায়

স্বামী বিবেকানন্দ
(১৮৬৩ - ১৯০২)

স্বামী অভেদানন্দ
(১৮৬৬ - ১৯৩৯)

যে মহম্মদ ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণির যোদ্ধা এবং সৃষ্টিছাড়া যুদ্ধনীতির উদ্ভাবক, যে মহম্মদ কেবল ইহুদি এবং খ্রীষ্টধর্মকে আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন; যে মহম্মদ পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মকে 'ধর্ম' বলেই স্বীকার করেননি, যে মহম্মদ মূর্তি পূজাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং ক্ষমাহীন পাপ বলে ঘোষণা করে গেছেন, যে মহম্মদ সমগ্র জীবন ধরে কামিনী আর কাঞ্চনের পেছনে ছুটেছেন এবং যে মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের ইহকালে কামিনী এবং কাঞ্চনের চরম ভক্ত হতে বলেছেন এবং পরকালে মদ, মাংস এবং চিরযৌবনা পিনোন্নতা পয়োধরা হুরী এবং তার সঙ্গে কিশোর বালক (গিলমান) প্রাপ্তির অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ যে মহম্মদের মতবাদকে 'রক্ত স্রোতের মতবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, মূর্তি পূজারী বিবেকানন্দজীর অনুজপ্রতিম এবং আজীবন-ব্রহ্মচারী স্বামী অভেদানন্দ সেই মহম্মদকে 'মহাত্মা' অভিধাযুক্ত করে তাঁর মহানুভবতা এবং উদারতার পরিচয় দিলেন, না অন্য কিছু? এ বিচারের ভার আমরা সুধী পাঠক মণ্ডলীর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

—

মূল্য ঃ ১৫ টাকা মাত্র